Deba Prasad Das

কুস্তিগীর থেকে গায়ক

চন্দন বনে গজিয়ে ওঠা অনেক অনামী তরু যেমন চন্দনের সুবাসে সুবাসিত হয়ে অনায়াসেই চন্দনের মর্যাদা পেয়ে যায়, আমার সংগীত শিল্পী হয়ে ওঠার প্রেক্ষাপটটিও অনেকটা ঠিক তেমনই। প্রথাবাহী পদ্ধতিতে হারমনিয়াম- তানপুরা নিয়ে বসে সকাল সন্ধ্যায় নিয়মিত সুরে-বেসুরে সা রে গা মা পা ধা নি সা রেয়াজ করে করে যেভাবে সকলের সংগীত শিক্ষার শুরু হয়ে থাকে, আমি বা আমার ভাইয়েরা কেঁউই সেভাবে কোনদিন গান -বাজনা শিখিইনি। শেখা হয়ে গেছে।

কারণ এমন একটা সাংগীতিক পরিবারে আমরা জন্মেছিলাম, যেখানে আমরা সংগীতের পেছনে নয়, বরং সংগীতই যেন ছায়ার মতো সবসময় আমাদেরকে অনুসরণ করে ঘুরে বেড়াতো। এবং এই অসম্ভব সম্ভব হতে পেরেছিল শুধুমাত্র সংগীতাচার্য কৃষ্ণচন্দ্র দের মতো বিরল সংগীত ব্যক্তিত্বের ভাইপো হয়ে এই পরিবারে আমরা জন্মেছিলাম বলে।

আমাদের বাড়ীতে প্রতি বছরই খুব জাঁক-জমক করে অন্নপূর্ণা পূজো,, লক্ষ্মীপূজো ইত্যাদি নানান পূজোপার্বণ হত এবং এই সব পূজোপার্বণ উপলক্ষে বাড়ীতে রাতে গান বাজনারও আসর হত। এখনকার দিনে যেমন কোন অনুষ্ঠান বা পূজো-পার্বণ উপলক্ষে অনেক বাড়ীতেই রাতে ভিডিও শো বা ঐ রকম কোন এন্টারটেনমেন্টের ব্যবস্থা থাকে, তেমনি তখনকার দিনে হ'ত কবির লড়াই, কথকতা, গানের আসর ইত্যাদি একেবারে দেশজ আমোদ প্রমোদ। তখনও তো ভিডিও ইত্যাদি যান্ত্রিক মনোরঞ্জক মাধ্যমগুলোর প্রচলন হয়নি, তাই উৎসব অনুষ্ঠান উপলক্ষে সমাগত অতিথি-অভ্যাগতদের সম্মানে, তাদের মনোরঞ্জনের উদ্দেশ্যে গান বাজনার আসর বসানোই তখন বাঙ্গালী সমাজের প্রচলিত রেওয়াজ ছিল। এমন কি কোন কোন ক্ষেত্রে এই সব আসরের আয়োজনের ওপর গৃহকর্ত্তার পদমর্যাদাও নির্ভর করত বলে শোনা যায়। যাই হোক, আমাদের বাড়ীতেও এই সব পুজো-পার্বণ উপলক্ষে প্রতিবছরই সারারাত ধ'রে গান- বাজনার আসর হ'ত এবং সেই সব আসরে বাদল খাঁ, জমীরুদ্দিন খাঁ, ছোটে খাঁ, দবীর খাঁ থেকে শুরু করে ভীষ্মদেব চট্টোপাধ্যায়, রাইচাঁদ বড়াল, শচীন কর্ত্তা, আমার কাকা এঁদের সকলের

গান তো হ'তই ,এছাড়া বাইরে থেকে আসা হাফেজ আলিখাঁ, ফৈয়াজখাঁ, প্রমুখ যে শিল্পীই তখন কলকাতায় অবস্থান করতেন , কাকার আমন্ত্রণে তাঁরাও অবশ্যই এসব আসরে উপস্থিত থেকে আসরকে অলংকৃত করতেন। আমার মনে আছে , একবার অন্নপূর্ণা পূজো উপলক্ষে কাকা আখতারী বাঈকে নিমন্ত্রণ করে নিয়ে এসেছিলেন। শুধু গজল সম্রাজ্ঞী হিসাবেই নয় , বেগম সাহেবার আভিজাত্য মেশানো চেহারার জেল্লাও তখন দেখবার মতো। সুর্মা আঁকা ঐ মায়াবী চোখে উনি যখন কারো পানে হরিণীর মতো চকিত চাহনিতে চেয়ে দেখতেন,মনে হ'ত গজলের সবচেয়ে নিখুঁত ছবিটিই যেন তার আঁখিকোণে আঁকা হয়ে যেত। সেই যে " হমদর্দ" ছবিতে একটি গান গেয়েছিলাম "বদল গয়া রঙ্ মেহ্‌ফিলকা যব তু মেহফিলমে আয়া ,রঙ্ উড়া হ্যায় ফুলোঁকা......" তেমনি বেগম সাহেবার আগমনে সেদিন আমাদের সেই মেহফিলের রঙ্ ও আলোর ঝলকানিতে হঠাৎই বদলে গিয়েছিল। আসরে বসেই বিষন্ন উদাসী সুরে উনি গান ধরলেন -" অ্যায় মোহব্বত তেরি অনজাম পে রোনা আয়া, না জানে কিঁউ আজ মুঝে রোনা আয়া।" এবং প্রেমের দুঃখ দেয়া পরিণতি নিয়ে গাওয়া সুরের বেদনাঘন আবেশে আমাদেরকে ভাসিয়ে দিয়ে, অনেকটা যেন ক্ষোভ মিশ্রিত সান্তনার সুরে সাথে সাথেই ধরে দিলেন আসরের দ্বিতীয় গান,-" মহোব্বত করনে বালে কম না হোঙ্গে , তেরি মেহফিলমে লেকিন হম না হোঙ্গে।" এবং তারপর একে একে গাইতে লাগলেন তার সেই সব বিখ্যাত গান,-" দিবানা বানানা হ্যায় তো , দিবানা বনাদে " ইত্যাদি ইত্যাদি। আমার মনে আছে, সে রাতে আসরে আর কারো গানই হ'লনা। আখতারী বাঈএর সুরের নেশায় সব যেন কেমন মাতাল হয়ে গিয়েছিল সে রাতে। তাঁর সেই অননুকরণীয় কন্ঠে, হৃদয় নিঙরানো সেই স্বতন্ত্র সুরের আবেদনে গজলের যে নেশা ধরানো রঙ্ উনি সেদিন সারা আসরে ছড়িয়ে দিয়েছিলেন , তেমনটা জীবনে আমি খুব কম শুনেছি। আরও স্পষ্ট করে বললে, হয়তো বা শুনিইনি আর কোন দিন।

পূজো- পার্বণ উপলক্ষে আয়োজিত এই সব সংগীতাসর ছাড়া অন্য সময়েও আমাদের বাড়ীতে প্রায় সবসময়ই গান-বাজনার আসর লেগেই থাকতো। বুদ্ধি হবার পর থেকেই দেখেছি কাকাকে কেন্দ্র ক'রে তাবড় তাবড় সব ওস্তাদজীরা সবসময়ই আমাদের বাড়িতে আসা-যাওয়া করছেন। আজ জমীরুদ্দিন খাঁ সাহেব আসছেন ; তো কাল দবীর খাঁ সাহেব। পরশু ছোটে খাঁ এলেন , তো তারপর দিন হয়তো খলিফা বাদল খাঁ সাহেব। এদের সাথে সাথে তবলা সঙ্গতকার হিসাবে কখনো ফিদা হোসেন খাঁ , কখনো আনোখেলাল , কখনো নথু খাঁ বা আবিদ হোসেন খাঁ ,কখনো বা পাখোয়াজী দর্শন সিং, দানী বাবু প্রমুখ গুণী যন্ত্রীরাও সবাই নিয়মিত আমাদের বাড়ীতে আসতেন , কাকাকে তালিম দিতেন, সঙ্গত করতেন , গল্প-গুজব ও খাওয়া- দাওয়া করতেন এবং কখনো কখনো

থেকেও যেতেন। এছাড়া বাইরে থেকে যখন যে ওস্তাদ কলকাতায় আসতেন, তাঁরাও আমাদের বাড়ীতে আসতেন, গান- বাজনা করতেন, থাকতেন, খেতেন। এক কথায় সংগীত জগতের এই সব মহীরুহেরা প্রায় সকলেই তখন একেবারে আমাদের বাড়ীর লোকের মতো হয়ে গিয়েছিলেন। তখন ঐ এতটুকু বয়সে তো এঁদের সাংগীতিক পারদর্শিতা, সংগীত মার্গে এদের অত্যুচ্চ শিখরে অবস্থান ইত্যাদি সাংগীতিক গুণাবলীর মূল্যায়ন করতে পারতাম না বা বুঝতামও না, শুধু ছেলে বেলার অপক্ক বুদ্ধিতে সকলের যেমনটা হয়ে থাকে, তেমনি আমরাও ভাবতাম, এরাও বুঝিবা বাবুকাকার মতোই আমাদের কাকা- জ্যাঠা গোত্রীয় কোন একান্ত পারিবারিক আপনজনই হবেন বা। তাই এঁনারা যখন কাকাকে তালিম দিতেন বা কাকার সাথে গল্প- গুজব করতেন, তখন সে বয়সের এত্তটুকু ছেলেপুলেরা সচরাচর যেমনটা করে থাকে, তেমনি আমি বা আমার অন্য ভায়েরাও সুযোগ পেলেই সেখানে গিয়ে দুষ্টামি শুরু করে দিতাম। এবং এঁনারাও বাবুকাকার মতই আমাদের এসব ছেলে মানুষি প্রফুল্ল চিত্তেই মেনে নিতেন। বিশেষত বাদল খাঁ এবং জামীরুদ্দিন খাঁ সাহেব আমাকে তখন খুবই স্নেহ করতেন তো বটেই, এমন কি হয়তো বা একটু মাত্রাতিরিক্ত প্রশয়ও দিয়ে ফেলতেন কখনো কখনো। অর্থাৎ সেই ভাষাহীন ছেলেবেলা থেকেই দিনের পর দিন শুনে গেছি রাগ- রাগিণীর নানান বন্দেজ, ফান্দা-সিলসিলা সবকিছু।এবং তাও কোন এলেবেলের কন্ঠে নয়, একেবারে খোদ শাস্ত্রীয় সংগীতের প্রবাদ-পুরুষদের কন্ঠে, একেবারে তাঁদের কাছে বসে। সংগীত শ্রবণের পাশাপাশি, সংগীতজগতের এত সব মহীরুহদের সাথে দিনের পর দিন থেকে থেকে এভাবেই গড়ে উঠেছিল সংগীতের সাথে আমার এই স্বতঃ মেল বন্ধন, নিজের অজান্তেই গড়ে উঠেছিল আমার সংগীত শিল্পী হওয়ার এই সুদৃঢ় প্রাথমিক বুনিয়াদ।

শৈশব পেরিয়ে কৈশোরে পা দেবার পর থেকেই আমি যখন খেলা-ধূলোয় ভীষণ ভাবে মেতে উঠলাম, যখন আসাবরী-জৌনপুরীর চেয়ে গুলি ডান্ডা, ফুটবল, সাতখোলামের রসেই পুরোপুরি মজে গিয়েছিলাম, তখন ও সকলের অজ্ঞাতেই আমার সংগীত শিক্ষার এই বুনিয়াদ দৃঢ় থেকে দৃঢ়তর হয়ে উঠছিল বিনা আয়াসেই। 'বিনা আয়াসেই' বলছি একারণেই যে, সে বয়সে ওস্তাদজীরা যখন কাকাকে তালিম দিতেন বা বাড়ীতে যখন গান-বাজনার আসর বসতো, তখন বিদগ্ধ শ্রোতায় ঠাসা সেই সব আসরে সবসময় যে আমি ঢোকবার সুযোগ পেতাম বা পেলেও যে উৎসাহ নিয়ে ঢুকতাম তা'তো নয়,বয়স ধর্মে আমার মন তখন সঙ্গীসাথী, গুলি -ডান্ডা ,ঘুড়ি ওড়ানো এসবেতেই সারাক্ষণ মজে থাকতো,তখন আমার সময় কোথায় সংগীতের মতো সর্ব্বশ্রেষ্ট ললিত কলায় মন দেবার! কিন্তু ঐ, ... " না চাহিলে যারে পাওয়া যায়, তেয়াগিলে আসে হাতে......" আমার বরাতেও হয়ে গেল তাই। কারণ আমি সংগীতে মন না দিলে কি হবে, ওস্তাদজীরা রাগ-রাগিণী তে আলাপ ধরতেই সেই

বুলন্দ সুরেলা বাড়তের সুর আমার চাওয়া - না- চাওয়ার কোন তোয়াক্কা না করেই বৈঠকখানার চৌকাঠ পেরিয়ে , উঠোন হয়ে অনায়াসেই পৌঁছে যেত বাড়ীর একেবারে অন্দর মহলে। এবং দিনের পর দিন বুঝে - না - বুঝে সেই সব রাগ- রাগিণী শুনতে শুনতে , সেই সব ছন্দদোলায় দুলতে দুলতে কোন কসরৎ ছাড়া এভাবেই শিখে গিয়েছিলাম ইমনের সেই বিখ্যাত বিলম্বিত মুখরা "এরি লালন ভারন...." , মুলতানের মিষ্টি দ্রুত বন্দেজ " লঙর মোহে ছড়া দে বনবারী ....." ইত্যাদি রাগ- রাগিণীর নানান বন্দেজ, স্বরের সিলসিলা , ফান্দা, সবকিছু। এমনকি একতাল, তিলওয়ারার মতো বিলম্বিত তালের সম্ , ফাঁক , চলনের মতো জটিল সাংগীতিক ব্যাপার গুলো পর্যন্ত।এই করতে করতে কখনো কখনো এমনও হয়েছে যে, জমীরুদ্দিন খাঁ বা বাদল খাঁ সাহেব যখন গানের ঘরে বসে তালিম দিতে দিতে কোন রাগের একটি তান- স্বরগম শুনিয়ে দিয়ে কাকাকে বলতেন ,-" আরে ইয়ে নয়া স্বরগম তো জরা শুনা দো," তখন ভেজানো দরজার পেছনে চুপিচুপি দাঁড়িয়ে থাকা এই আমি, কাকা স্বরগমটা শুরু করার আগেই যেমনটা ওস্তাদজী শুনিয়েছেন , ক্ষুদে 'নক্কালের ' মতো হুবহু তেমনটাই গেয়ে দিয়ে, লাগা ছুট। তাই শুনে ওস্তাদজী তখন তাঁর দরাজ গলায় হাঁক দিতেন , -" আরে মানা বেটা, ইধর অন্দর তো আ। জরা সামনে আকে তো মুজে শুনা যা।" আর কে তখন অপেক্ষা করে ওস্তাদজীর হাঁক শুনবার জন্য, তাঁকে তান শুনাবার জন্য ! আমি তো ততক্ষণে পৌঁছে গেছি বাড়ীর একেবারে ত্রিসীমানার বাইরে। কিন্তু এত করেও , সংগীতের থেকে এভাবে দূরে দূরে পালিয়ে বেড়ানোর আপ্রাণ চেষ্টা করেও বাস্তবে পালানো আমার আর হয়নি। " আমি যত যেতে গেছি , দূর থেকে দূরে, সে ততই বেঁধেছে যে মোরে , বাণী আর সুরে , আপনার ছন্দময় মহুয়া - সুরে।"

এই করে করে শৈশব পেরিয়ে মধ্য কৈশোরে পৌঁছানোর পর যখন বাবুকাকার দেখা -শোনার দায়িত্বভার কিছু কিছু করে আমার ওপরও বর্তাতে লাগলো , তখনো, আমার অজ্ঞাতেই বা আরও স্পষ্ট করে বললে আমার অনিচ্ছাসত্ত্বেই আমার সংগীত শিক্ষার বুনিয়াদটা এত পাকা হয়ে গিয়েছিল , যেটা অভাবনীয় তো বটেই , অন্যকারো পক্ষে সেই বয়সে তেমনটা হওয়া অসম্ভবও। কাকা তো অন্ধ ছিলেন , তাই ওস্তাদজীদের দেখাশোনা করা বা গানের বন্দেজ গুলো লিখে নেয়া ইত্যাদি কাজকর্ম গুলো উনি নিজে হাতে করতে পারতেন না। সেই সমস্তই করতে হ'ত আমাদেরকেই। ওস্তাদজীরা তালিম দিচ্ছেন, কাকা শিখছেন, আর পাশাপাশি আমি, আমার বড়দা বা ছোটভাই প্রভাস যে কোন একজন ঘন্টার পর ঘন্টা ধরে বসে সেই সব বন্দেজ , স্বরলিপি সব কিছু শুধু শুনে শুনে লিখে যাচ্ছি , এটা তখন আমাদের প্রতিদিনকার রুটিন-ওয়ার্ক হোয়ে গিয়েছিল। আবার উনি যখন বাইরে কোথাও গান গাইতে যেতেন , তখনও প্রয়োজন মতো আমাদের কাউকেই আবার খাতা

দেখে সে সব গান প'ড়ে দিতে হ'ত। এমনকি আমি বড় হবার পর এমনও হয়েছে যে, কাকা যখন এইচ. এম. ভি তে গান রেকর্ড করতেন, তখনও বহুবার কাকার পেছন থেকে নীচু গলায় সে সব গান আমি বা আমার বড়দা বা প্রভাস খাতা দেখে prompt করে দিয়েছি। এসব গুলোর যে কি মূল্য, তখন তো সে সব আমি বুঝতাম না, তাই খেলা ফেলে কাকার সাথে থেকে থেকে ঐসব কাজ কর্ম করতে কখনো কখনো খুবই বিরক্তও যে হতাম না, তেমন নয়, কিন্তু পরে বড় হয়ে যখন সংগীতকে নিয়েই পথ চলা শুরু করলাম, তখন বুঝেছি যে নিজের ছেলেমানুষী ইচ্ছের বিরুদ্ধেও ওসব করে করে গানের ক্ষেত্রে আমার বা আমার অন্য ভাইয়েদেরও কি মস্তবড় একটা সাংগীতিক শিক্ষা সেদিন নিজেদের অজ্ঞাতেই হয়ে গিয়েছিল। বিশেষত সর্বভারতীয় ক্ষেত্রে গান-বাজনা করতে হলে প্রথম যেটা আয়ত্ব করা দরকার, যেমন হিন্দী ভাষাটাকে ভালোভাবে জানা, ভাষাটাকে ভালোভাবে বলতে পারা ইত্যাদি ব্যাপার গুলো খুব নির্ভুল ভাবেই সেদিন আমার শিক্ষা হয়ে গিয়েছিল। যেমন, কোন খাঁ সাহেব হয়তো কাকাকে কোন রাগের বিলম্বিত বন্দেজ শেখাচ্ছেন, -" এ করতার ......"। আমি ভেতো বাঙ্গালীর ঘরের ছেলে, "করতার " এর অর্থই জানিনা, সঠিক হিন্দী উচ্চারণও জানিনা। আমি ওস্তাদজীকে শুনে শুনে বাঙ্গালীর ধারায় লিখতাম, -" এ কর্তার ....."। তখন খাঁ সাহেব বা কাকা যে কেউ সাথে সাথে সেটা শুধরে দিতেন। বলতেন, - ওটা "কর্তার " নয়, হিন্দীতে ওটার উচ্চারণ হবে, - " এ করতা(আ)র ", অর্থাৎ -"হে ভগবান।" কাকার জন্য লিখতে গিয়ে এভাবেই হিন্দী ভাষাটা নির্ভুল ভাবে আমার আয়ত্ব হয়ে গিয়েছিল অনেকটা প্রায় বিনা আয়াসেই। তারপর সুরকী পহচান, " সা রে গা মা " কী জিনিষ, পর্দা কী জিনিষ, কোমল রেখাব, কড়ি মধ্যম কী জিনিষ, শ্রুতি কী জিনিষ, কোন্ রাগে কোন পর্দা কি ভাবে লাগে, সুর লাগাবার রীতি, শাস্ত্রীয় সংগীতের এই সমস্ত কিছুই ওস্তাদদের গান শুনতে শুনতে এবং কাকার জন্য সেগুলো হুবহু লিখতে লিখতেই আমার শেখা হয়ে যেত। কেউ আমাকে হাতে ধরে এসব গুলো কোনদিনই শেখায়নি। কেউ কোন দিন বলে দেয়নি এটা সা, ওটা রে ইত্যাদি। এমনকি আমার কাকাও নয়। আসলে কাকা আমার গুরু হলেও, গুরু-শিষ্যের সম্পর্কটা সেই ট্রাডিশনাল ধাঁচের ছিলনা। কাকা ছিলেন আমাদের বন্ধুর মতো, উনি আমাদেরকে গান শেখাচ্ছেন, না পাড়লেই গাঁট্টা দেবেন, এমন কোন ব্যাপারই ছিলনা। উনি বলতেন, ললিতকলা ব্যাপারটা এমনই একটা বিষয়, যেটা কেউ কাউকে শেখাতে পারে না, যদি না, শিক্ষার্থীর অন্তরে সেই বীজ না থাকে। বলতেন, - পক্ষী-শাবক যেমন তার মা-বাবার উড়ান দেখে, ভুল করে করেও একদিন ঠিক আকাশে উড়ে যায়, অথচ কেউ তাকে হাতে ধরে উড়তে শেখায়না, তেমনই তুমিও শুনে শুনে দেখে দেখে আত্মিক খোঁজ নিয়ে চেষ্টা করতে করতে একদিন ঠিক সুরের আকাশে

উড়ে যেতে পারবে। তোমার খোঁজই তোমাকে তোমার লক্ষ্যে পৌঁছে দেবে। এতে আমার করার কিছুই নেই। আমার ভূমিকা নেহাৎই সেই পক্ষী দম্পতির মতো। শুধুই উড়ে উড়ে দেখানো এবং যতদিন না উড়তে পারছো, ততদিন সকাল সন্ধ্যায় ঠোঁটে করে খাওয়ার পৌঁছে দেয়া। এর বেশী কিছু নয়।

কাকার জন্য এভাবে লিখতে লিখতে, মুখোমুখি বসে ওস্তাদজীদের গান শুনতে শুনতে, এভাবেই শাস্ত্রীয় সংগীতের অনেক কিছুই আমরা তখন শিখে গিয়েছিলাম, হয়তো কাকা কোন খাঁ সাহেবের কাছে মালকোশের তালিম নিচ্ছেন এবং ওস্তাদজীর গায়ন শুনে শুনে কাকার কথা মতো আমিও সেসব লিখে নিচ্ছি, দেখলাম, খাঁ সাহেব যে আলাপ - বিস্তার করছেন তাতে রেখাব ও পঞ্চম লাগছে না এবং মধ্যম ছাড়া বাকী স্বর কোমল। তখনও তো মালকোশ রাগের নামই শুনিনি আমি। ভাবছি এটা আবার কি রাগরে বাবা ! তবু যেমনটা শুনলাম হুবহু অনুলিপি করেনিলাম বন্দেজ ইত্যাদি সব। গান শেষ হতেই কাকাকে জিজ্ঞেস করলাম, এ রাগে রেখাব ও পঞ্চম লাগলো না কেন ? তখন কাকা বুঝিয়ে দিলেন যে এটা হচ্ছে রাগ- মালকোশ। ঔরব জাতির রাত্রি কালীন রাগ। এ রাগে রেখাব- পঞ্চম বর্জিত। পঞ্চম লাগালেই এটা হয়ে যাবে সম্পূর্ণ - মালকোশ নামের একেবারে অন্য রাগ। ব্যস, আমারও একটা বিরাট শিক্ষা হয়ে গেল। শুনলাম মালকোশের সুরের সিলসিলা, বন্দেজ, তান- স্বরগম, জেনে গেলাম এর তাত্ত্বিক দিকও। এভাবেই কোন্ রাগে কোন্ পর্দা লাগেনা, লাগলেও কি নিপুণ ভাবে সেটা লাগে, টোড়ীর রেখাব এবং মূলতানীর রেখাব লাগানোর "তরিকা" কি, দরবারী এবং মিঞামল্হারের কোমল গান্ধারের পার্থক্য কি, এই সমস্ত খুঁটিনাটি ব্যাপার গুলোও খুব সহজ- সরল ভাবেই আমাদের জানা হয়ে গিয়েছিল সে সময়।

এভাবে বেশ কিছুদিন চলার পর কাকা একদিন হঠাৎ, একেবারে হঠাৎই আমাকে বল্লেন, -" নাওতো মানা, তানপুরাটা একটু ছাড়োতো।" কাকার কথা শুনে আমার তো একেবারে আকাশ থেকে পড়ার মতো অবস্থা !' আমি, যে কি-না তানপুরা ছাড়া তো বহুদূর, ওস্তাদজীদের অনুলিখন ছাড়া সংগীতের আর কিছুই জানিনা, সে কিনা তানপুরা ছাড়বে কাকার মতো এতবড় গাইয়ের সাথে ! কিন্তু কাকার যেন কোন ভ্রুক্ষেপই নেই এব্যাপারে। এমন ভাবে বল্লেন, যেন তানপুরা ছাড়ায় আমি কতদিনের সিদ্ধহস্ত ওস্তাদ এবং আমাকে কিছু ভাববার সুযোগ না দিয়েই উনি প্রস্তুতও হয়ে গেলেন গান গাইবার জন্য। পালাবার পথ না পেয়ে অগত্যা আমিও যেমনটা এতদিন অন্যদেরকে দেখেছি, মন্ত্রমুগ্ধের মতো কম্পিত আঙ্গুলের ছোঁয়ায় তেমন করেই ধীরে ধীরে তানপুরায় সুর ছাড়তে লাগলাম। কিন্তু নিজের কানেই বেশ টের পেলাম যে যেমনটা সবাই ছাড়েন, যেমন মিঠে সুরে একটা ধারাবাহিকতা রেখে তানপুরা

ছাড়ার রীতি , তেমনটা যেন মোটেও হচ্ছে না । কেমন যেন শুধুই একটা ছাড়া- ছাড়া ট্যাং- ট্যাং আওয়াজ বৈ তো নয়। কিন্তু কাকা এই নিয়ে একবারের জন্যও টুঁ শব্দটিও করলেন না , দিব্যি গাইতে থাকলেন আমার ছাড়া তানপুরার ঐ ট্যাং-ট্যাং অ-সুরেই । পরদিনও আবার সেই একই ব্যাপার। সেদিনও কাকা আমাকেই ডেকে নিলেন তানপুরা ছাড়ার জন্য। ভর্ৎসনার বদলে এমন বাৎসল্য মেশানো উৎসাহ পেয়ে আমিও লজ্জা- মান- ভয় ছেড়ে খুব চেষ্টা করতে লাগলাম আরো ভালো করে তারের ওপর আঙ্গুলগুলো চালাতে , আরো ভালো করে সুর ছাড়তে , যেমনটা আর সবাই ছাড়েন , এবং এই করতে করতেই কবে যে তানপুরা ছাড়ার ক্ষুদে ওস্তাদ বনে গিয়েছিলাম ,বুঝতেও পারিনি। আসলে কাকার শিক্ষা দেয়ার টেকনিকটাই ছিল ওরকম। সেই যে একেবারে দ্রোণাচার্য্য - একলব্যের মতো গুরু - শিষ্যের ব্যাপার , সেটা কাকার মধ্যে একেবারেই ছিলনা কোনদিন।

তানপুরা ছাড়ার প্রসঙ্গেই মনে পড়ে গেল বহুদিন আগেকার একটি স্মরণীয় ঘটনার কথা। তখন আমি মোটামুটি বড় হয়ে গেছি। কলেজ - টলেজে পড়ি। কাকার সাথে বাড়ীর বাইরে এখানে-ওখানে গানের আসরেও অল্প- বিস্তর যাতায়াত করছি। তেমন সময় কাকার একদিন ডাক এলো কৃষ্ণনগরের রাজবাড়ীতে গান গাইতে যাবার। কাকা ছাড়া ভীষ্মদেব চট্টোপাধ্যায় , জ্ঞানেন্দ্র প্রসাদ গোস্বামী , শচীনদেব বর্মন , রাইচাঁদ বড়াল প্রমুখ অন্যান্য শিল্পীরাও সেখানে আমন্ত্রিত ছিলেন। নির্দ্দিষ্ট দিনে এঁরা সকলেই সেখানে গান গাইতে গেছেন। কাকার তল্পিবাহক তথা তানপুরা বাদক হিসেবে আমিও কাকার সাথে গেছি। রাজবাড়ীর আসর বলে কথা। ঝাড় বাতি টাতি জ্বেলে সে এক দেখবার মতো পরিবেশ। বিশাল ফরাশ পেতে তাতে গির্দা , পিকদান ইত্যাদি সাজিয়ে একেবারে যেন মায়াময় গন্ধর্ব লোক। রাত দশটা নাগাদ আসরের প্রথম শিল্পী হিসেবে গাইতে এলেন শচীন কর্ত্তা। এর পর জ্ঞান গোঁসাই , ভীষ্মদেব চট্টোপাধ্যায় প্রমুখ এক এক করে সকলের গান হয়ে যাবার পর আসরের শেষ শিল্পী হিসেবে গাইতে এলেন আসরের মধ্যমণি বাবুকাকা কৃষ্ণচন্দ্র দে। কাকার পেছনে ডানপাস ঘেঁসে তানপুরায় বসেছি আমি। আমাকে তানপুরা ছাড়ার ইঙ্গিত করেই কাকা গান ধরলেন কাফি রাগের একটি দ্রুত খেয়াল। খোলা গলায় ওরকম সুর লাগাতেই মুহুর্তের মধ্যে আসরের রূপ একেবারেই বদলে গেল। অদম্য প্রাণের সুরেলা উচ্ছলতায় সারা আসর যেন নিমেষে নেচে উঠল। সুরের আকাশে কাফির রামধনু রঙ্ ছড়িয়ে দিয়ে শুরু করলেন ঠুংরী অঙ্গের যোগিয়া ঘেঁষা একটি বাংলা গান এবং ঠুংরীর ঐ আবেশে সকলকে ভাসিয়ে দিয়ে পরক্ষণেই উনি শুরু করলেন বাঙ্গালীর যথার্থ হৃদয়ের গান , তার চির শান্তির গান , - কীর্ত্তন গান। বাইরে তখন রাতের আঁধার কেটে গিয়ে সবে পূব আকাশে লালের আভা ফুটে উঠেছে, ভোরের হাওয়া ছড়িয়ে দিচ্ছে একটা মিষ্টি আমেজ সকলের দেহ-মনে , ক্লান্ত চাঁদ

সেদিনের মতো শেষবারের তরে দেখে নিচ্ছে ঘুমন্ত পৃথিবীটাকে, এমন একটা মায়াময় সন্ধিক্ষণেই কাকার কন্ঠে ললিত রাগের বুকে জেগে উঠল খন্ডিত নায়িকার বেদনার্ত চিত্তের বুকফাঁটা হাহাকার। শ্রীমতির সেই বিরহ-বেদনার সামিল হয়ে, তার সহমর্মী হয়ে আসর সুদ্ধু লোক তখন অঝোর ধারায় কাঁদছে। এদিকে কাকার পিছনে বসে তানপুরা ছাড়তে থাকা আমার যুবামনও নিজের অজান্তেই কখন যে ভিজে গেছে মাথুরের রসে, কখন যে আঙ্গুল গুলো তানপুরার তারের ওপর নিথর দাঁড়িয়ে গেছে, হুঁশ নেই। সম্বিত ফিরে পেলাম, যখন পাশের কে একজন ঠেলা মেরে বল্লেন,- " কেষ্টদা সব তারগুলো স্পষ্ট করে বাজাতে বলছেন।" আহাঃ, কি সব দুর্লভ সঞ্চিত স্মৃতি! এই পড়ন্ত বয়সে, এই ডামাডোলের বাজারে মাঝে মাঝে তাই ভাবি, কোথায় গেল বাবুকাকার মতো সব ক্ষণজন্মা শিল্পীরা, যারা সুর লাগাতেই আসরের রঙ্ একেবারে বদলে যেত, কোথায় গেল বাংলার সেই মহান স্বতন্ত্র গান - কীর্ত্তন গান, কোথায় গেল আমার সেই স্বপ্নিল ছেলেবেলার মধুময় দিনগুলো! সংগীতের এই এত বিশাল যান্ত্রিক উন্নতির যুগে বসেও মনটা মাঝে মাঝে তাই কেমন যেন উদাস হয়ে যায়। হৃদয়ের এই নস্টালজিক অনুভূতি গুলোই হয়তো আমার কন্ঠে উত্তমকুমারের লিপে সেদিন ফুটে উঠেছিল "চিরদিনের" ছবির সেই হারানো দিনের গানে,- "ফুল পাখী বন্ধু আমার ছিল, তারা কোথায় গেল, কোথায় গেল, কোথায় হারিয়ে গেল..........!" তবুও হৃদয়ের এই আর্ত জিজ্ঞাসা, এই নস্টালজিক আক্ষেপের সান্ত্বনাও হয়তো একদিন শেষ পর্যন্ত আমিও খুঁজে পেয়েছিলাম, আমার নিজের গাওয়া কোন একটি গানে। যেখানে মুক্তি রায় চৌধুরীর দরদভরা কথা এবং প্রভাসের নস্টালজিক সুরে আপন প্রাণের তাগিদেই আমি গেয়েছিলাম আমার সত্যানুসন্ধানী বাস্তবানুগ সেই গান,-"সোনার এইদিনগুলো, জীবনের দিন গুলো ঝরে যায়, যাবে ঝরে, যাবে ঝরে। তারে ধরাও যায়না, রাখাও যায়না, মায়ার বাঁধনে তারে বাঁধাও যায়না। যতই সুধা থাক অন্তর ভরে .... সব মেনে নিয়ে একদিন যাবো সরে। সোনার এই দিনগুলো, জীবনের দিনগুলো ঝরে যায়, যাবে ঝরে যাবে ঝরে।"

আমার হারমোনিয়াম বাজনা শেখার শিক্ষাটাও ঐ তানপুরা বাজানো শিক্ষার মতোই অনেকটাই যেন নিজের অজান্তেই স্বয়ংক্রিয় ভাবেই হয়ে গিয়েছিল। কাকা হাতে ধরে আমাকে কোনদিনই দেখিয়ে দেন নি যে এটা সা, এটা রে, ওটা গা, ওটা মা ...... ইত্যাদি ইত্যাদি। আমার নিজেরও তাতে তেমন কোন উৎসাহই ছিলনা। ঐ লিখতে লিখতে বা তানপুরা ছাড়তে ছাড়তে অন্যদেরকে হারমোনিয়াম বাজাতে দেখেছি, ঐ পর্যন্তই, এর চেয়ে বেশী কিছু নয়, সত্যিকথা বলতে, গান -বাজনা ব্যাপারটাতেই তো আমার তখন তেমন কোন উৎসাহই ছিল না। কিন্তু যে কাকা আমাদের সমস্ত ওজর -আব্দার পূরণ করে দেন, অভিভাবক

মহলে যে কাকা আমাদের সবচেয়ে আপনজন,সেই বাবুকাকা বলতেন বলেই নিজের ইচ্ছে অনিচ্ছে বিসর্জন দিয়ে ঘন্টার পর ঘন্টা লিখে যেতাম , তানপুরা ছাড়তাম ইত্যাদি ইত্যাদি। তা না হলে কখন ছুটে চলে যেতাম মাঠে , যেখানে বন্ধুরা সব নানান খেলায় মেতে হৈ হুল্লর করছে। এভাবে চলতে চলতে একদিন হ'ল কি , কাকা রেয়াজে বসেছেন , আমিও তানপুরা ছাড়ার জন্য প্রস্তুত , এবং আমার ছোটভাই ভেলু পাশে বসে সব দেখছে, এমন সময় কাকা হঠাৎ বল্লেন ,-" মানা , আজ ভেলুই না হয় আমার সাথে তানপুরা ছাড়ুক, তুমি বরং বাবা আমার সাথে ঐ হারমোনিয়ামটাই একটু বাজিয়ে দাও।" উনি কিন্তু খুব ভলোভাবেই জানতেন যে হারমোনিয়াম আমি আদৌ বাজাতে জানিনা , কোনদিনই বাজাইওনি। অথচ সেই আমাকেই কিনা বলছেন ওনার সাথে হারমোনিয়াম বাজিয়ে দিতে! আসলে ওটা ছিল কাকার শিক্ষাদানেরই একটা পদ্ধতি মাত্র। শিক্ষা ব্যাপারটাকে শিক্ষার্থীর কাছে ভারী বোঝা না বানিয়ে , সেই একই জিনিষ খুবই হাল্কা চালে নেহাৎই খেলাচ্ছলে শিখিয়ে দেয়ার পথটিই কাকা সেদিন বেছে নিয়েছিলেন। তখন তো এতসব কথা বুঝতাম না , ভাবতাম , বাজাবার কেউ কাছে পিঠে নেই , তাই হয়তো আমাকেই বাজাতে বলছেন।যাইহোক ,কাকা যখন বাজাতে বলেছেন , তখন , জানিনা বা পারবো না বলবার তো আর কোন জো নেই। অগত্যা বসতেই হ'ল হারমোনিয়াম নিয়ে। এতদিন সবাইকে যেমন করে বাজাতে দেখেছি , সেভাবেই খুব চেষ্টা করতে লাগলাম কাকাকে follow করতে। আর follow করা মানে তো উনি যা গাইছেন, সেটার পুনরাবৃত্তিই শুধু নয় , সেটাকে improvise করা , notes এর permutation - combination নিয়ে ভাবনা চিন্তা করা , সেইমতো সুরের বাড়ত বিস্তার করা , - সবই করতে চেষ্টা করতে লাগলাম। এই ভালো করে সাথ-সঙ্গত করার তাগিদ , যতটা না সাঙ্গীতিক তাগিদে , তারচেয়ে শতগুণ বেশী কাকাকে খুশী করার তাগিদে। কারণ কাকা খুশী হওয়া মানেই তো বেহিসেবী মন্ডা-মিঠাই খাওয়ার মহাভোজ লেগে যাওয়া। তাই কাকা যেটাই করতে বলতেন , খুব চেষ্টা করতাম সে কাজটা নিখুঁত ভাবে করে দিয়ে কাকাকে খুশি করে দিতে। হারমোনিয়াম বাজানোর ব্যাপারেও শিক্ষার চেয়ে মূলত কাকাকে খুশী করার তাগিদটাই আমাদের মধ্যে বেশী থাকতো। কাকাকে খুশী করতে পারার এই তাগিদ থেকেই অল্প কয়েকদিনের মধ্যেই হারমোনিয়াম বাজনাটাও আমার বেশ রপ্ত হয়েছিল এভাবেই।

এভাবেই বেশ কাটছিল দিন। খেলা -ধূলো নিয়ে অসম্ভব রকম মেতে থেকে ওস্তাদজীদের সুরের সাম্রাজ্যে, বাবুকাকার সুরেলা সান্নিধ্যে এভাবেই বড় হয়ে উঠছিলাম আমি। এভাবেই খেলতে খেলতে , ছাদে ঘুড়ি ওড়াতে ওড়াতে বুঝে- না -বুঝে আপন মনেই উদাত্ত কন্ঠে গেয়ে উঠতাম বাদল খাঁ সাহেবের গাওয়া কোন গান , কখনো কাকার গান,

কখনো বা আমার সে বয়সেব ভালোলাগা শিল্পী শচীন দেব বর্মনের গান। রাগ-রাগিণীর কিছুই বুঝিনা ,গলাও সাধিনি কোনদিন, তবু উড়তি ঘুড়ির দ্রুত চর্কির ছন্দে ছন্দে অনায়াসেই গুন - গুনিয়ে উঠত তান - স্বরগমের এলোপাথাড়ি সুর। এভাবেই বড় হয়ে উঠেছিলাম আমি। যে বড় হওয়ায় এছাড়া তেমন কোন বিশেষ ফারাক চোখে পড়বার মতো ছিলনা, আর পাঁচ জনের থেকে। নিতান্তই সাদামাটা বেড়ে ওঠার মতোই বৈশিষ্ট্যহীন। কারণ ওস্তাদজীদের কাছে বসে তাদের সাথে যতই গুনগুন করিনা কেন, যতই কাকার অনুকরণে খোলা গলায় আবোল - তাবোল সুর ভাজিনা কেন, তাতে অন্তত আর যা-ই হোক ,ঐ পুঁচকে মানার পরবর্তীতে মান্না হয়ে ওঠার মতো তেমন কোন বৈশিষ্ট্যই আমার জীবনে কোনদিনই প্রতিফলিত হয়নি। ক্লাসের শেষ বেঞ্চের কোন ছেলের মতোই একেবারে নিরুত্তাপ ছিল আমার ছেলেবেলার সাংগীতিক জীবন।

স্কুলের গন্ডি পেরিয়ে স্কটিশচার্চ কলেজে ভর্তি হবার পর থেকেই মূলত আমার জীবনের গতি ধীরে ধীরে বদলে যেতে থাকে। একদিকে কৈশোর পেরিয়ে যৌবনের নতুন রঙে রেঙে কল্পনার হাওয়ায় শুধু শরতের মেঘেদের ছুঁয়ে ছুঁয়ে ভেসে যাওয়া, অন্যদিকে স্কুল জীবনের এত বছরের একটা বাঁধাধরা গন্ডির বাইরে এসে কো-এড্ কলেজের মুক্ত অঙ্গনে পিঞ্জর মুক্ত একঝাঁক পাখীদের মতো দলবেঁধে শঙ্কাহীন উচ্ছল ছুটে চলার রঙ্গিন বসন্ত দিন। এত সব কিছু মিলে স্কটিশের প্রত্যেকটি ক্ষণ হয়ে উঠেছিল আমার জীবনের সার্ব্বিক সন্ধিক্ষণ। যৌবনের প্রথম অনুভূতি থেকে শুরু করে , মানা থেকে মান্না দে হয়ে ওঠা পর্যন্ত জীবনের অনেক মূল্যবান কিছুরই turning point বা সন্ধিক্ষণ এই স্কটিশচার্চ কলেজ। সেই উঠতি বয়সের বহু মিষ্টি মধুর স্মৃতিরও নীরব সাক্ষী এই স্কটিশ চার্চ কলেজ। আজ এই বয়সেও যখন কখনো স্কটিশের পাশদিয়ে যাই , যখন দূর থেকে চকিতে কলেজ-করিডোরে একালের একঝাঁক নতুন ছেলে - মেয়েকে আনন্দোচ্ছল ঘুরে ফিরতে দেখি, সেই কোন ভীষণ চেনা থামের গায়ে দাঁড়িয়ে যখন কোন সদ্য যুবক -যুবতীকে কোন ইস্যু নিয়ে নিবিড় তর্কে ডুবে থাকতে দেখি , মুহূর্তেই মনের গহনে কেমন যেন মোচড় দিয়ে ওঠে। খুব মিস্ করি আমাদের সেদিনের সেই সোনাঝরা নানা রঙের দিনগুলোকে , বিশেষত কলেজের অফ পিরিয়ডের ঐসব বাঁধভাঙ্গা উচ্ছল মূহুর্ত গুলো ! আহাঃ হাঃ ! জীবনের কী সব চির অম্লান স্মৃতি বিজড়িত সেই সব মিষ্টি দিন ! আহাঃ হাঃ ! জানি, জীবনের "পৌষের কাছাকাছি রোদমাখা " সেই সব দিন ,... "খুশী আর লজ্জার মাঝামাঝি " সেই সব দিন ... কোন দিনই আর ফিরে পাবোনা। তবু সেদিন গুলোর জন্য কেন জানিনা মাঝে মাঝেই মন কেমন করে। ভীষণ নস্টালজিক হয়ে পড়ি নিজের অজান্তেই। আসলে রবীন্দ্রনাথের মতো অতিসহজ করে তো বলতে পারিনা,- " ফুরাইলে দিস ফুরাতে", তাই -

"ভাঙ্গা মন্দিরের টৈরাকোটার জন্যে মন কেমন করে

... আবার সেনেট হলের সিঁড়ির জন্যেও।
.........মাঝে মাঝে গাণ্ডীবের জন্যে মন কেমন করে
আবার একতারার জন্যেও।" - তবু শেষ পর্যন্ত
রবীন্দ্রনাথের " হঠাৎ দেখা" র মতো করে নিজেকেই নিজে অস্ফুটে
শুধোই ,-" আমাদের গেছে যেদিন
সেদিন কি একেবারেই গেছে
কিছুই কি নেই বাকী !" তার পর নিজেই এক সময়
খুঁজে পাই কবির উপলব্ধ সেই চিরন্তন বাণী ,-" রাতের সব তারাই
থাকে দিনের আলোর গভীরে।" খটকা লাগে ,কী জানি বানিয়ে বল্লেম
নাকি ! স্কটিশ সরে যায় দূর থেকে দূরে , আমি মিশে যাই একালের
জনতার যান্ত্রিকতার ভীড়ে।

আমার জীবনে স্কটিশের সবচেয়ে মূল্যবান স্মৃতি নিঃসন্দেহে রাশভারী অধ্যাপকদের ছায়ামুক্ত অফপিরিয়ড গুলো। কারণ , আমি দেখেছি , স্কটিশের কথা ভাবতে গেলে প্রথমেই ঐ সব অফপিরিয়ড গুলোর কথাই বার বার মনে পড়ে যায়। আমি জানিনা ছাত্রজীবনে কলেজ বা বিশ্ববিদ্যালয়ে এই সব অফপিরিয়ডের বিশেষ ভূমিকা নিয়ে কোন কবি - সাহিত্যিক কখনো সেভাবে ভেবেছেন কিনা বা ঐনিয়ে কোন কবিতা - উপন্যাস কখনো লেখা হয়েছে কিনা। কিন্তু আমার নিজের অভিজ্ঞতা থেকে মনে হয় যে , এই নিয়ে কেউ সিরিয়াস ভাবে কাজ করলে হয়তো রূঢ় বাস্তব মুখী অতি মূল্যবান কোন উপন্যাস লেখা যেতে পারে। হয়তো এটা আমার মতো অসাহিত্যিকের একান্তই ব্যক্তিগত ধারণা। কিন্তু আমার ব্যক্তিগত বিশ্লেষনে আমি দেখেছি , আজ আমি যেটুকুই নিজের অস্তিত্ব কে প্রতিষ্ঠিত করতে পেরেছি, তাতে স্কটিশের শিক্ষাসম্পর্কিত ক্লাসের প্রভাব যতটা না খুঁজে পাই , তার চেয়ে অনেক বেশী খুঁজে পাই অফপিরিয়ড গুলোর প্রভাব। জীবনের অন্যান্য ছোটখাটো দিক গুলোর কথা না হয় ছেড়েই দিলাম , কিন্তু আজ " মান্না দে" বলে আমার সামান্য হলেও যে সার্বিক পরিচিতি , অর্থাৎ সংগীত শিল্পী হিসেবে যে একটু সর্বভারতীয় ভালোবাসা শ্রোতারা আমাকে দিয়েছেন , গানকে সত্যি সত্যিই শ্রোতাদের কাছে সেভাবে তুলে ধরার প্রথম সোপান কলেজের সেই অফপিরিয়ড গুলো। এবং সেই গানকে শেষপর্যন্ত অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে বৃহত্তর শ্রোতৃ হৃদয়ে পৌঁছে দেয়ার প্রথম সোপানও স্কটিশচার্চ কলেজের সেই অফপিরিয়ড বা অফপিরিয়ডের সর্বক্ষণের প্রিয় সঙ্গীসাথীরা। সেই শুরুর কথাই আজ এই মূহুর্তে খুব মনে পড়ছে।

ছোটবেলা থেকেই আমিতো একটু ডানপিটে , হৈ-হুল্লোড় ভালো-বাসা লোক। তাছাড়া বন্ধু-বান্ধবদের মধ্যে নিজের একটু খানি importance আদায় করে নেয়ার প্রবল ইচ্ছা অর্থাৎ বন্ধু মহলে সর্দারি করার চেষ্টা ছেলেবেলা থেকেই আমার মধ্যে কাজ করতো। এমন কি যখন আমরা কাবাডি খেলতাম , কিংবা সাত খোলাম খেলতাম , তখনও আমার

উপর কেউ টেক্কা দিলে, খুব গাঁট্টা দিতাম। তার উপর কলেজে পৌঁছতে পৌঁছতে কুস্তি ল'ড়ে ল'ড়ে বাহুবলেও অনেকের চেয়েই বলীয়ানই ছিলাম। তাছাড়া "সারা বাংলা কুস্তি প্রতিযোগিতায় " ফাইনাল রাউন্ডে লড়ার সুবাদে মুখে মুখেই সারা কলেজে পালোয়ান হিসেবেও পরিচিতি পেয়ে গিয়েছিলাম। এই সব কিছু মিলে বন্ধুমহলে তখন আমার বেশ একটা বহুকাঙ্খিত নেতা নেতা ভাব। তা, স্বঘোষিত নেতা যখন হয়েছিই, তখন অনুগত প্রিয় বন্ধু-বান্ধবদের নিয়ে নেতা সুলভ কিছু একটা করা উচিৎ। সেই "উচিৎ কর্ম " টিই সমাধা হ'ত বহু স্মৃতি বিজরিত সেই সব প্রিয় অফ-পিরিয়ড গুলোয়। অর্থাৎ আড্ডা - হৈ - হুল্লোড় আর সংগীত। তবে অঙ্ক কষ। দেখা যাবে যে আড্ডা ও হৈ-হুল্লোড়ে যতটা সময় যেত, তার দ্বিগুণ সময় কেটে যেত বিভিন্ন ধারার গান-বাজনা করে। গান-বাজনা মানে সেই যে একেবারে হারমোনিয়াম - তবলা টবলা নিয়ে বেশ একটা মেহ্ফিল মেহ্ফিল ব্যাপার, আদৌ সেরকম কোন সিরিয়াস প্রথাবাহী ব্যাপারই নয়। হাতের কাছে যখন যা জুটে যেত, চেয়ার -টেবল - সাইকলের বেল, তাতেই তাল ঠুকে ঠুকে খালি গলায়, খোলা গলায় শুধু একেরপর এক লাগাম হীন উচ্ছল - উদাত্ত গান গেয়ে যাওয়া। এবং বয়সধর্মে অবশ্যই সে সব গানের অধিকাংশই হ'ত প্রেমের গান। বিশেষত ইংরেজী ভাষার গান। কারণ বৃটিশরা তখনো এদেশ থেকে বিতাড়িত হয়নি এবং তারাই তখনো আমাদের দন্ডমুন্ডের তৎকালীন সর্ব্বময় নিয়ন্তা রূপে বহাল তবিয়তে এদেশে বিরাজমান। কিন্তু এই সব নিয়ন্তাদের সন্তান-সন্ততিদের জন্য সঠিক অর্থে একেবারে আলাদা কোন স্কুল - কলেজ না থাকায় বা থাকলেও খুবই সীমিত সংখ্যায় থাকায় তারাও বাধ্যহত আমাদের মতো নিতান্ত ভেতো বাঙ্গালী পড়ুয়াদের সাথে একই কলেজে, একই বেঞ্চে বসে পড়াশোনা করতে। বিশেষত স্কাটিশচার্চ, প্রেসিডেন্সী বা বেথুন কলেজের মতো কিছু কিছু নির্দিষ্ট কলেজ তো বটেই। তেমনই কয়েকজন খোদ বৃটিশ ছেলে - মেয়ে আমাদের সাথেও পড়ত, আমাদের একই ক্লাশে। এদের মধ্যে দু-একজনের খুব মিষ্টি গানের গলা ছিল। এছাড়া পুরোপুরি মিশনারী স্কুল থেকে আসা বাঙ্গালী এলিট পরিবারের বেশ কিছু ছেলে-মেয়েও আমাদের ক্লাশে ছিল।এরাও খুব ভালো ইংরেজী গান গাইতে পারতো। এই সব কিছু মিলিয়েই আমাদের সেসব " করিডোর - জলসা " বা " কমনরুম- মেহ্ফিলে" তুলনা মূলকভাবে ইংরেজী গান-বাজনাও প্রাধান্য পেত। আর কি সব মিষ্টি মিষ্টি একেবারে নতুন ধারার নতুন স্বাদের গান। আঃ হা হাঃ। শুনতাম, আর আশ্চর্য হয়ে যেতাম ইংরেজী গানের ঐ সব নতুন রকমের বীট্স, নতুন রকমের অ্যাপ্রোচ, নতুন রকমের নোট্স এর কম্বিনেশন শুনে। বস্তুত ইংরেজী গানের সাথে সেই আমার প্রথম আক্ষরিক অর্থে মেলবন্ধন, প্রথম জানাশোনা। এর আগে তো কাকার গান, ওস্তাদজীদের গান শুনে শুনে ভারতীয় মেলোডি ভিত্তিক গানের

মেজাজ বা সুরের কান তৈরী হয়েই গিয়েছিল, এবার কলেজের এইসব বন্ধু-বান্ধবদের গান শুনে শুনে ইংরেজী গানের বিস্তীর্ণ অন্য একটা জগতের অর্গল যেন এক এক করে আমার চোখের সামনে খুলে যেতে থাকলো। ওরা গাইতো, আমি অবাক হয়ে দেখতাম ইংরেজী গানের মেজাজ, গানের লিরিক এবং সে লিরিককে সুরে বলার তরীকা ইত্যাদি সব কিছু আমাদের ভারতীয় গান-বাজনা থেকে কত ভিন্ন। মনে আছে ওদের কারো মুখেই একটি গান শুনেছিলাম যেখানে প্রেমিকা তার প্রেমিককে বলছে,-"......... তোমার কী স্পষ্ট করে মনে পড়ে, কবে আমি তোমাকে আমার প্রেম জানিয়েছিলাম, কবে আমি তোমায় প্রথম বলেছিলাম,- 'আমি তোমাকে ভালোবাসি'!" আহাঃ কি ভীষণ মিষ্টি গান। জীবনের কত কাছাকাছি ছোঁয়া লাগানো গান! ভাবলে আজও যেন জীবনের সেই মূহুর্ত গুলোকে স্পর্ষ্ট অনুভব করি। অরজিনাল গানটা এখন আর মনে নেই। কিন্তু সেই উঠতি বয়সে, যৌবনের ছোঁয়া লাগা সেই আশ্চর্য বয়সে ভারতীয় প্রেম সংগীতের প্রেক্ষাপটে ওরকম মিষ্টি, হৃদয়ের অন্তঃস্থল থেকে উঠে আসা ওরকম প্রাণবন্ত লিরিক শুনে সেদিন সজ্ঞানেই আমি তার প্রেমে পড়ে গিয়েছিলাম। পরবর্ত্তীকালে বাংলা - হিন্দী সহ ভারতীয় বিভিন্ন ভাষায় এত এত প্রেমের গান গাওয়ার পরও মাঝে মাঝে মনে হয়, ঐরকম একেবারে ভিন্ন স্বাদের প্রেমের গান বোধয় আজও আমার গাওয়া হয়নি, হয়তো হবেওনা আর কোন দিন। হয়তো আমাদের গীতিকাররাও ফুল, পাখী. চাঁদিনী, বাতায়ণ থেকে সম্পূর্ণ বেরিয়ে এসে সেই মাত্রার প্রেমের গান লেখার খুব বেশী চেষ্টাও করেন নি কোনদিন। তাই রবীন্দ্রনাথের অনুকরণে আজ এই বয়সে আমারও খুব বলতে ইচ্ছে হয়- " আমার প্রেমের গান জানি, গেলেও বিচিত্র পথে হয় নাই সে সর্বত্রগামী।"

ইংরেজী গানের প্রবাদ প্রতীম ব্যক্তিত্ব বিং ক্রমবি, পেরি কমু, ফ্রাঙ্ক সিমাত্রা, জীমরীভ্‌স এই নাম গুলোর সাথেও সেই আমার প্রথম পরিচয় ইংরেজ বন্ধু এবং বান্ধবীদের মুখে মুখে শুনে, এদের গান, তা সে বন্ধুদের কন্ঠেই হোক বা তখনকার দিনের সেই ঢাউস সাইজের গ্রামোফোন রেকর্ডেই হোক, যখন যেভাবেই হোক আমার খুব ভালো লাগতো। বিশেষত জীমরীভ্‌স, আহাঃ কী সব দুর্দান্ত গান। জীমরীভ্‌সের কথা বলতে গেলে বলতেই হয় যে ইংরেজ গায়কদের মধ্যে ওর আমি ভীষণ ফ্যান। ওর বিখ্যাত একটি গান ছিল -" O DANNY BOY..... down the mountain side the summer gone........" . জানিনা, এগানের মধ্যে, এ গানের নোট্‌স গুলোর মধ্যে কোথায় কী যেন একটা দুঃখ লুকিয়ে ছিল, আমাকে ভীষণ touch করতো। আসলে এমনিতেই তো কল্যাণ ঠাঁটের রাগ গুলো আমার খুব প্রিয়, তার ওপর রীভস সাহেবের ওরকম গায়কী, সব মিলে আমি ওর গানে এত influenced হয়ে গিয়েছিলাম যে পরবর্ত্তীতে শ্যামল গুপ্তের লেখা " আমি আজ

একেলা ” গানটি সুর করার সময় ঐ গানের সুর এবং গায়কী খুব স্পষ্টভাবেই অবগুন্ঠিত নববধূর মতো ছায়া ফেলে গিয়েছিল আমার সুর করা তথা গাওয়া এই বঙ্গজ গানে। পাশ্চাত্য গানের ব্যাপারে জীমরীভ্স আমার জীবনে অনেক কিছু। ওর জীবনের আর একটি অতি স্মরণীয় গান তো আমার সংগীত জীবনেরও একেবারে টার্নিং পয়েন্টের সাথে অঙ্গা অঙ্গিভাবে যুক্ত হয়ে গেছে, ওর একটা গান ছিল - " I was dancing tennis balls......" খুবই বিখ্যাত গান। হয়তো ওর জীবনের শ্রেষ্ঠ গানগুলোর অন্যতম এই গান। আমার শোনা ইংরেজী গানের মধ্যেও হয়তো প্রিয়তম এই গান। এ গানের ছন্দ, সুর, গায়কী আমাকে ভীষণভাবে ছুঁয়ে গিয়েছিল সে সময়। এবং এরই ফলশ্রুতি আমার জীবনের প্রথম বেসিক বাংলা গান, -" হায় হায় গো , রাত যায় গো , দূরে তবু রবে কি ......"। বন্ধুবর গৌরীপ্রসন্ন মজুমদারের লেখা আমার জীবনের এই প্রথম বেসিক বাংলা গানের সুরে, তার আবেদনে , কী ভীষণ ভাবে মূর্ত্ত হয়ে বাংলা গানের জগতে আমার প্রতিষ্ঠার ভিত গ’ড়ে দিয়েছে, " I was dancing ... " এবং " হায় হায়গো রাত যায়গো " গান দুটো পাশাপাশি শুনলেই সেই অপ্রিয় সত্য স্পষ্ট হয়ে যাবে। ওয়েস্টার্ণ গানের সুরের পথ বেয়ে এই যে বাংলা গানের জগতে আমার আগমন ও প্রতিষ্ঠা প্রাপ্তির সূচনা, এর পেছনে কিন্তু এক কথায় স্কটিশের সেই দিনগুলোরই প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ প্রভাব কার্যকর। এই সব কিছু মিলিয়েই বার বার আমার মনে হয়েছে যে ‘মানা’ থেকে "মান্না দে" হয়ে ওঠার ব্যাপারে স্কটিশের অবদান আমার জীবনে নিঃসন্দেহে অপরিসীম।

খোদ বৃটিশ এবং বৃটিশ প্রভাবিত ভেতো বাঙ্গালী গায়ক পরিবৃত স্কটিশের সেই সব করিডোর -মেহ্ফিলে আমারও তখন যথেষ্ট প্রতিপত্তি ছিল। সংগীতাচার্য কৃষ্ণচন্দ্র দের ভাইপো বলে কথা। গান না গাইতে পারলে যে মান -সম্মান নিয়ে টানাটানি। কাকার এবং তাবড় তাবড় ওস্তাদজীদের গান-বাজনা শুনে শুনে ততদিনে সুরের কান তো বেশ তৈরীই হয়ে গেছে এবং সংগীতোপযোগী জন্মগত কন্ঠও নেহাৎ খারাপ ছিলনা। তাই দিয়েই টেবিল - চেয়ার চাপড়ে খালি গলায় কাকার গান গেয়ে বা আরও স্পষ্ট করে বললে কাকার গানের জেরক্স কপি করার আপ্রাণ চেষ্টা করে করে সেইসব করিডোর- মেহ্ফিল মাতিয়ে দিতাম। কাকার গান ছাড়া আর গাইতাম শচীনকর্ত্তা মানে শচীন দেব বর্মনের গান। অবিভক্ত বাংলার উঠতি শিল্পীদের মধ্যে তখন শচীনদার খুব নাম -ডাক। বিশেষ করে তাঁর প্রেমের গান গুলো তো তখন এত জনপ্রিয় হয়ে উঠেছিল যে নিজের অজান্তেও কোন উদাসী মূহুর্তে " ও কালো মেঘ বলতে পারো" , " বঁধূ এলো মধু রাতে", বা " নিশীথে যাইও ফুল বনে রে ভ্রমরা" " আমি ছিনু একা "ইত্যাদি কোন গান , আনমনে গুনগুন করেনি এমন বাঙ্গালী যুবা বোধহয় সারা বাঙলা দেশে তখন একজনও ছিল কিনা সন্দেহ। প্রসঙ্গক্রমে বলা দরকার যে , ত্রিপুরায় থাকাকালীন শচীনদা কিন্তু মূলত "টিপরাই

Deba Prasad Das

বংশী " বাদক ছিলেন এবং সেই সঙ্গে তবলাও বাজাতে পারতেন বেশ চমৎকার। এই পর্যন্তই, এর বেশী কিছু নয়। সেই বাদক থেকে একেবারে ভারত বিখ্যাত গায়ক তথা সুরকারে রূপান্তরিত হওয়ার সূত্রপাত বস্তুত কলকাতায় এসে কলেজে পড়াকালীন আমার কাকা কৃষ্ণচন্দ্রদের শিষ্যত্ব গ্রহণ এবং প্রথাবাহী পদ্ধতিতে বহুদিন ধরে কাকার কাছে সংগীতের তালিম। কিন্তু আশ্চর্যের ব্যাপার হচ্ছে কাকার মতো ওরকম বড় মাপের জনপ্রিয় লঘু সংগীতের শিল্পী তথা সর্ব্বজন শ্রদ্ধেয় শাস্ত্রীয় সংগীতের দিকপাল ব্যাক্তিত্বের কাছে সংগীতের হাতেখড়ি থেকে শুরু করে একেবারে গায়ক হিসেবে আত্মপ্রকাশ পর্যন্ত সুদীর্ঘ বছর অতিবাহিত হওয়ার পরও কিন্তু কাকার ছায়ামুক্ত একেবারে স্বতন্ত্র গায়কী, স্বতন্ত্র আবেদন শচীনদার গানের মধ্যে প্রথম থেকেই লক্ষ্য করা গেছে। এবং নিঃসন্দেহে এই স্বতন্ত্রতার জন্যেই এস. ডি. বর্মন আজও আমাদের কাছে - the great, immortal এবং এই স্বতন্ত্রতার জন্যই কাকার মতো ওরকম বড় মাপের শিল্পী জনপ্রিয়তার মধ্য গগনে থাকা সত্ত্বেও শচীনদার গান নতুন ভাবে, একেবারেই নতুন ভাবে বাঙ্গালী হৃদয়কে, বিশেষ করে বাঙ্গালী যুব সম্প্রদায়ের হৃদয়কে ওরকম ভাবে সেদিন সমূলে নাড়িয়ে দিয়েছিল। এমনকি কৃষ্ণচন্দ্রর সর্ব্বক্ষনের সাথী, তার গান বাজনার উত্তরসূরী এই আমিও শচীন দার গানে ভীষণ ভাবে মাতোয়ারা হয়ে আমাদের করিডোর মেহ্ফিলে সেই সব গান যে শুধু গাইতামই তাই নয়, একেবারে তাঁর ঐ অননুকরণীয় আনুনাসিক স্বরক্ষেপন পর্যন্ত হুবহু নকল করতে শুরু করেদিয়েছিলাম। আমার নকল গলার সেইসব মেকি গান শুনিয়ে শুনিয়ে দিনের পর দিন বন্ধুদের বাহবা ও হাততালি পেয়ে পেয়ে আমার আত্মশ্লাঘাও তখন এমন পর্যায় পৌঁছে গিয়েছিল যে, আমিও মনে মনে নিজেকে বেশ কেষ্টবাবু ও শচীনকর্ত্তার সমগোত্রীয়ই ভাবতে শুরু করে দিয়েছিলাম আরকি!!

এই সব নকল গানের সুবাদেই বন্ধুমহলে অচিরেই " গায়ক " হিসেবে আমার বেশ একটা রেপুটেশন হয়ে গিয়েছিল এবং সেই রেপুটেশনের ফলশ্রুতিতেই সেবারের ইন্টার - কলেজ মিউজিক কম্পিটিশনের সময় বন্ধুরা সব ধরে বসল," এবার মিউজিক কম্পিটিশনে তোকে নাম দিতে হবে।" ওদের এই প্রস্তাবে আমি যে সেদিন কীরকম ঘাবড়ে গিয়েছিলাম কি বলব ! কারন খালি গলায় যত যা-ই গাইতে পারিনা কেন, এবং সে সব গান শুনে বন্ধুরা যতই বাহবা দিকনা কেন, ভেতরে ভেতরে আমি নিজেতো জানি আমি আসলে কী, আমার দৌড় আসলে কত দুর। -রীতিমতো গান -বাজনা শেখা ছেলে-মেয়েদের সাথে প্রতিযোগিতায় কত সহজেই যে আমার শিখী- পাখা খসে গিয়ে বায়স স্বরূপ খুলে পড়বে, সেটা আমার চেয়ে ভালো তখন আর কে জানতো! অথচ এই গূঢ়রূঢ় সত্য বন্ধুদেরকেও বলার জো নেই, বললেই আমার এতদিনকার নেতৃত্বের ফানুসও নিমেষেই চুপসে যাবে।

তখন এই "গিলতেও পারিনা, ফেলতেও পারিনা" অবস্থায় অনেক ভেবে চিন্তে দুকূল বাঁচিয়ে ওদেরকে বল্লাম যে, "দ্যাখ, অফ পিরিয়ডে হৈ - হুল্লোড় করে টেবিল চাপড়ে তোদেরকে গান শোনাই, সে অন্য ব্যাপার। কিন্তু তাই বলে একেবারে ঐ কম্পিটিশনে নাম লিখিয়ে দেয়া, সেটা ভাই একেবারেই অসম্ভব ব্যাপার। কারণ কাকা এসব গুলো একদম পছন্দ করেন না। কাকার অনুমতি ছাড়া আমি প্রতিযোগিতায় বসতে পারবো না।" বলে বেশ যেন একটু আশ্বস্ত হলাম। ভাবলাম, যাক সময়মতো গুছিয়ে কিছু একটা বলতে পেরে এযাত্রায় বন্ধুদের হাত থেকে ক্ষণিক অন্তত স্বসম্মানে বাঁচা গেল। কিন্তু আমার শুভাকাঙ্খী বন্ধুরাও তাদের এই দলনেতাকে দিয়ে, তাদের করিডোর -মেহ্‌ফিলের great maestroকে দিয়ে কম্পিটিশনে গান গাওয়াতে যেন বদ্ধপরিকর। আমার ওরকম এড়িয়ে যাওয়া মুলক জুতসই বাহানা শুনে এতটুকুও হতোদ্যোম না হয়ে আমাকে না জানিয়েই পরদিন সকালবেলা সোজা বাবু কাকার কাছে এসে উপস্থিত। বল্লে, -"কাকাবাবু, আমাদের কলেজে আন্তর্কলেজ সংগীত প্রতিযোগিতা হবে, আমাদের ইচ্ছে, মানা সেখানে গান করুক। কিন্তু আপনার অনুমতি ছাড়া মানা সেখানে গাইতে রাজী হচ্ছে না, আপনি যদি অনুমতি দেন তো.....।" সব শুনে কাকা বল্লেন, -"কি ! মানা কম্পিটিশনে গান গাইবে ! মানা গান-বাজনার জানেটা কি শুনি ! ওতো কোনদিন গানই শেখেনি, ও আবার কম্পিটিশনে কি নাম দেবে !!" ওরা বল্লে, - " মানা তো আপনার গান, শচীনদেব বর্মনের গান একেবারে হুবহু গাইতে পারে। ও যতটা গাইতে পারে, কলেজ কম্পিটিশনে তাই দিয়েই চলে যাবে।" কাকা বললেন, - " না,না, না আমার ভাইপো ওরকম 'চলে যাবে' মার্কা স্ট্যান্ডার্ড নিয়ে কম্পিটিশনে গান গাইবে, এ হয়না। আর গান-বাজনা ব্যাপারটা ওরকম ছেলে খেলার ব্যাপার নয়। না শিখে কখনো গান গাওয়া যায়না, গাওয়া উচিৎ নয়।" এই সব বলে কাকা ওদেরকে ফেরৎ পাঠিয়ে দিলেন। দরজার আড়াল থেকে সমস্ত কিছু শুনে আমিও ভাবলাম যাক এ যাত্রায় শেষ পর্যন্ত তাহলে কোন মতে বাঁচা গেল।

সেদিন কলেজে যেতেই অধ্যক্ষ ডঃ আরকুহার্ট সাহেবের চেম্বারে অপ্রত্যাশিত ভাবেই আমার তলব পড়ল। তখনকার দিনে অধ্যক্ষ -ছাত্রের সম্পর্কতো এখনকার মতো এত সহজতর হয়ে ওঠেনি, হয়ে ওঠেনি এত খোলামেলাও, তাই তলব পেয়ে প্রথমটায় বেশ ঘাবড়েই গিয়েছিলাম। তবু ডেকেছেন যখন, তখন যেতে তো হবেই। ভয় ভয় মনে গেলামও। গিয়ে দেখি আমার করিডোর মেহ্‌ফিলের সব বন্ধুরাও সেখানে দাঁড়িয়ে। বুঝলাম আমাদের পুরো দলটাকেই উনি ডেকে পাঠিয়েছেন। হয়তো অজ্ঞাতভাবেই বড়রকমের কোন অপরাধ আমরা অবশ্যই করে ফেলেছি। কিন্তু না। তেমন কোন ব্যাপারই নয়। আমাকে অবাক করে দিয়ে সোজা জিজ্ঞেস করলেন, -" Hello my boy, you do sing, don't you? Are you not interested to participate in the intercollegiate

music competition ?? ” ততক্ষণে আমি বুঝে গেছি আমার সংগীতভক্ত বন্ধুরা আমার অজ্ঞাতেই কোন্ মহান কর্মটি করে বসেছেন এবং অধ্যক্ষ আরকুহার্টের চেম্বারে কেন আমার এত জরুরী তলব। ঘটনা যা ঘটার শেষ পর্যন্ত তাই ঘটল। কাকার উদ্দেশ্যে লেখা আরকুহার্ট সাহেবের একটি স্বনির্বন্ধ চিঠি নিয়ে পরদিন সকালেই বন্ধুরা সব আবার কাকার কাছে এসে উপস্থিত। আরকুহার্ট সাহেব লিখেছিলেন ,-“ Sir ......it is our motto to find out the hidden talents of the student , just an approach to help them have the right exposure . Who knows which oyster bears the pearl ! So, the college authority will be grateful to you if you kindly allow Probodh to participate in the forthcoming intercollegiate music competition . Hope your good self will consider the case ...." খোদ আর্কুহার্টের ওরকম চিঠি পেয়ে কাকার বিধি নিষেধের বরফ যেন একটু একটু করে গলতে শুরু করল , ওদেরকে বল্লেন, ঠিক আছে তোমরা যাও , আমি দেখছি কি করা যায়। ওরা চলে যেতেই কাকা আমায় ডেকে বল্লেন তোমার অধ্যক্ষ এবং বন্ধুরা সব তো তোমাকে কম্পটিশনে গাওয়াতে একেবারে উঠে পড়ে লেগেছে, এই যে তোমার অধ্যক্ষ আর্কুহার্টের চিঠি। এব্যাপারে তোমার নিজের কি ইচ্ছা ? বল্লাম,-“আপনি শিখিয়ে দিলে আমি নিশ্চয় গাইতে পারবো। ”বল্লেন,- “তোমাদের প্রতিযোগিতা কবে থেকে শুরু ? ” বল্লাম ,-“ দুমাস পরে।” উনি বল্লেন,- “ ঠিক আছে , তুমি প্রতিযোগিতায় গাইবে, তবে একটা শর্তে । তোমাকে প্রতিযোগিতার সব ক'টি বিষয়েই যোগ দিতে হবে এবং আজ থেকে তুমি আমার কাছে নিয়মিত রেয়াজ করতে বসবে।” -সেই আমার প্রণালীবদ্ধ সংগীত শিক্ষার শুরু , যে শুরুর পুরো কৃতিত্বটাই স্কটিশের বন্ধু-বান্ধব এবং মহানুভব অধ্যক্ষ ড ঃ আরকুহার্ট সাহেবের।

সুর-তাল- লয়ের জ্ঞান তো ছিলই, জন্মগত কন্ঠটিও নেহাৎ মন্দ ছিলনা , সেই সঙ্গে সকাল -সন্ধ্যায় নিয়মিত কাকার কাছে বসে মাসখানেকের মধ্যেই বেশ কিছু আয়ত্ব করে ফেল্লাম। কাকার তালিম আর আমার শিক্ষা মিলে আমার মনের অবস্থা তখন ঠিক যেন রেসের ঘোড়ার মতো। মানে একবার শুধু ছেড়ে দিক ,গেয়ে সকলকে তাক লাগিয়ে দেবো। এরকম একখানা ভাব। কম্পিটিশনের দিন হ'লও ঠিক তাই। ধ্রুপদ, ধামার ,খেয়াল ,ভজন,কীর্ত্তন , বাউল , ভাটিয়ালি , টপ্পা, গজল সবতেই আমি ফাস্ট। শুধু ঠুংরী আর আধুনিক গানেতে সেকেন্ড। সেবার জহরলাল মুখার্জী বলে বঙ্গবাসী কলেজের একটি ছেলে ঠুংরীতে হয়েছিল প্রথম , আমি হয়েছিলাম দ্বিতীয়। আর ঐ বঙ্গবাসী কলেজেরই আর একটি ছেলে সত্য চৌধুরী হয়েছিল আধুনিক গানে প্রথম , আমি হয়েছিলাম দ্বিতীয়। পরে এই ছেলেটির বেশ কয়েকটি আধুনিক গানের রেকর্ডও বেরিয়েছিল হিন্দুস্থান অথবা এইচ্. এম. ভি থেকে এবং বেশ জনপ্রিয়ও হয়েছিল সে সব গান। এছাড়া পৃথ্বীশ বলে একটি ছেলের

গানও আমার খুব ভালো লেগেছিল , সেও পুরস্কার পেয়েছিল বেশ কয়েকটি। যাই হোক, সেই আমার জীবনের প্রথম শ্রোতার সামনে স্টেজে ওঠা এবং জয় করে ফিরে আসা। এরপরও আমি পরপর তিন বছর ইন্টার কলেজে যোগ দিই এবং তিন বছরই চ্যাম্পিয়ন হই । ইন্টার কলেজ ছাড়া ১৯৩৭ এ আয়োজিত অল বেঙ্গল মিউজিক কম্পিটিশনেও আমি যোগ দিয়েছিলাম , যেখানে অন্যান্য সুকন্ঠ প্রতিযোগিদের মধ্যেও অন্যতম প্রতিযোগী ছিলেন পরবর্ত্তী কালের বাংলা গানের প্রথিতযশা শিল্পী ধনঞ্জয় ভট্টচার্য। এবং সেই প্রতিযোগিতার অন্যতম পরীক্ষক ছিলেন স্বয়ং কৃষ্ণচন্দ্র দে। এইসব প্রতিযোগিতার ব্যাপারে আমার তখনকার মানসিক প্রতিক্রিয়া সম্পর্কে বলতে হলে বলব যে , প্রতিযোগিতা ব্যাপারটা সবসময়ই আমার কাছে একটা চ্যালেঞ্জ , একটা এগিয়ে যাবার তীব্র প্রেরণা। যখনই কোন প্রতিযোগিতায় আমি সেকেন্ড হয়ে গেছি , তখনই আমার জেদটা খুব বেড়ে যেতো , আপ্রাণ চেষ্টা করতাম কি করে আরো ভালো গাইবো , কি করে আগামীতে ফার্স্ট হতে পারবো। শুধু গান- বাজনাই নয় ,জীবনের প্রত্যেক ক্ষেত্রেই এই আপ্স এন্ড ডাউন গুলো আমার খুব ভালো লাগে। মনে হ'ত সেকেন্ড হয়েছি বলেই না আজ ফার্স্ট হওয়ার জন্য এত কসরৎ করছি। এবং আমি দেখেছি এতে সব সময়ই আমি ভালো ফলও পেয়েছি। এই মানসিকতা, এই প্রচেষ্টার জন্যই পরবর্ত্তীতে সংগীতকে জীবিকা করে চলার পথে কোন ধারার গানেই কোন পরিচালক আমাকে ঠেকাতে পারেনি কোনদিন। বরং যখনই একটু অন্যরকমের গান , একটু ব্যতিক্রমী কম্পোজিশন তৈরী হয়েছে, সেক্ষেত্রে সংগীত পরিচালকেরা আর সবাইকে বাদ দিয়ে এক কথায় চোখ বুঁজে সে সব গান আমাকে দিয়েই নিশ্চিন্তে গাইয়েছেন। আমার সংগীত জীবনে নিঃসন্দেহে এটা একটা উল্লেখনীয় ঘটনা। রফি, মুকেশ, কিশোর এরা নিঃসন্দেহে অতি উঁচু মার্গের শিল্পী , নিঃসন্দেহে এদের গানের সংখ্যা তথা জনপ্রিয়তাও আমার চেয়েও বেশী। কিন্তু অপ্রিয় হলেও সত্য যে সংগীতের বহুধা প্রবাহিত ধারার প্রেক্ষাপটে এদের প্রত্যেকেরই একধরনের বিশেষ সীমাবদ্ধতা বরাবরই খুব স্পষ্টভাবেই লক্ষ করা গেছে। যেমন রফি সাহেব। দেশী সুরের গানে ওঁর সমকক্ষ সেদিন কেউ ছিলনা , হয়তো হবেওনা আর কোনদিন। অথচ ওয়েস্টার্ন সুরের গান হলেই , সযত্নে সে গান ওঁ এড়িয়ে যেত। যেমন কিশোর। ওঁর সাম্রাজ্যে তো ও নিঃসন্দেহে একমেবাদ্বিতীয়ম সম্রাট। কিন্তু রাগ সংগীতের যে লগন , কাওয়ালির যে আন্দাজ,সেক্ষেত্রে ওঁর সীমাবদ্ধতা বোধহয় নতুন করে বলার আর অপেক্ষাই রাখেনা। আর মুকেশ তো ওঁর ঐ হৃদয় মথিত একধরণের বিশেষ গানে পারদর্শিতা ও জনপ্রিয়তার শীর্ষে উঠে একেবারে " টাইপ সিঙ্গার " হয়ে গিয়েছিল। যে টাইপ সিঙ্গিং এর বাইরে এসে অন্য ধারার গান বাজনা করার কথা ওঁ নিজেও ভাবতে পারতেন

না কোনদিন। কিন্তু আমার ক্ষেত্রে এধরণের সীমাবদ্ধতা আমি নিজে অন্ততঃ উপলব্ধি করিনি কোনদিন। "চলত মুসাফির মোহলিয়ারে .... এর মতো দেহাতী গান থেকে শুরু করে "আও টুইস্ট করে .... " এর মতো পাশ্চাত্য সুরাশ্রয়ী গান, রাগাশ্রয়ী গান, কাওয়ালি, গজল ইত্যাদি যখন যেটা গাওয়ার নির্দেশ এসেছে, কোনদিনই কোন গান গাওযার ব্যাপারেই আমি পিছু পা হইনি। এমনকি কিশোরের সাথে দ্বৈত ভাবে গাওয়া - " ইয়ে দোস্তি হম নেহি ছোড়েঙ্গে " গানে আমি নিজেকে যতটা সাবলীল ভেবেছি, "বসন্ত বাহার " ছবিতে ভীমসেন যোশীর সাথে -" কেতকী গুলাব জুঁহী " গাওয়ার সময় ও নিজেকে তার চেয়ে এতটুকুও কম সাবলীল মনে হয়নি। আসলে বাবু কাকা নিজেতো ছিলেন সব ধারার গানেরই অবিসংবাদিত অথরিটি, তাই আমাদের ঐ ইন্টার কলেজ মিউজিক কম্পিটিশনে সমস্ত বিষয়ে আমাকে যোগদান করিয়ে, সমস্ত কিছু গাইতে পারার একটা চ্যালেঞ্জিং মনোভাব সংগীত শিক্ষার প্রথম সোপানেই উনি আমার মধ্যেও জাগিয়ে দিয়েছিলেন। সব কিছু গাওয়ার এই চ্যালেঞ্জিং মনোভাব, কূটতম সুরের কম্পোজিশনকেও নিখুঁত ভাবে গাইতে পারার এই যোগ্যতার জন্যই হয়তো শেষপর্যন্ত আমি টিকেঁ গিয়েছিলাম। এবং সেটা হিন্দী গানের ক্ষেত্রে যতটা সত্য বাংলা গানের ক্ষেত্রেও তারচেয়ে কম সত্যতর নয়।

ইন্টার কলেজ মিউজিক কম্পিটিশনে ওরকম ভালো result দেখে বন্ধুরা সব তো যার পর নাই আনন্দিত বটেই, খোদ আর্কুহার্ট সাহেব পর্যন্ত তাঁর চেম্বারে ডেকে আমায় সেদিন অভিনন্দন জানিয়ে আশীর্বাদ করেছিলেন। বাড়ী ফিরতে কাকাও খুব বললেন, বাঃ বেশ গেয়েছো, খুব গেয়েছো ইত্যাদি ইত্যাদি। ওরকম রেজাল্ট শুনে মা ও খুব খুশী হলেন। কিন্তু ব্যস, ঐ পর্যন্তই। এরপর থেকে বাড়ীর অন্য কেউতো নয়ই, এমনকি বাবুকাকাও আমার গান- বাজনার ব্যাপারে আর কোন উচ্চবাচ্যই করেন না। আজকালকার দিনে যেমন বাড়ীর কোন ছেলে-মেয়ে গান- বাজনা, খেলা-ধূলো, পড়াশোনা যে কোন কিছুতেই ভালো রেজাল্ট দেখালে অভিভাবকেরাই বেশ উৎসাহ নিয়ে পরিচিত মহলে ঢ্যারা পিটিয়ে সেই সুসংবাদ প্রচার করতে থাকেন এবং সেই মেয়েটিকে বা ছেলেটিকে সেই লাইনে আরো উন্নতি করানোর আপ্রাণ তাগিদে একেবারে আদাজল খেয়ে লেগে পড়েন, তখনকার সামাজিক রীতিনীতির প্রেক্ষাপটে আমার গান গেয়ে চ্যাম্পিয়ন হওয়ার ব্যাপারে তেমন কিছু তো হ'লই না, বরং ওখানেই আমার গান বাজনার তখনকার মতো ইতি হয়ে গেল। নিজে তো আমাকে তালিম দিতে আর ডাকেনই না, উল্টে আমি নিজে যেচে কিছু বললেই বলেন, -" হবে, হবে, সব হবে। সময় আসুক সব হয়ে যাবে। " সবকিছু মিলে একদিকে তীব্র ইচ্ছে নিয়েও কাকার কাছে গান নিয়ে বসতে না

পারার অসহ্য মানসিক যন্ত্রণা ,অন্যদিকে আমার মতো ওরকম ডানপিটে , চঞ্চল মতি ছেলের পক্ষে - " হচ্ছে , হয়ে যাবে " ধরনের ঢিমে তেতালার আশ্বাস বাণীও মোটেই শ্রুতি মধুর মনে হচ্ছিল না। আমার সংগীত শিক্ষার প্রাথমিক পর্বে সে এক ভীষণ মানসিক যন্ত্রণার সময় গেছে। কিন্তু কী আর করি ! কাকার ওপর রাগ করবারও জো নেই , কারণ অভিভাবকদের মধ্যে কাকাই ছিলেন আমাদের সবচেয়ে কাছের , একেবারে বন্ধুর মতো এবং তখন পর্যন্ত গান- বাজনার যতটা যা শিখেছি তার সমস্তই এককথায় কাকার সাহচর্য , তালিম এবং প্রশ্রয়ে। তাই কাকার আশ্বাস শিরোধার্য করে চলতে লাগলো আমার খালি গলার গতানুগতিক উচ্চৈশ্রবা হ্রেসা - কূজন এবং সেই সঙ্গে কাকার অনুপস্থি - তিতে প্রতিযোগিতা উপলক্ষে শেখা গান -বাজনার প্রথাবাহী রেয়াজ। হয়তো আমার অজান্তে কোনকোনদিন সে সব গান- বাজনা কাকা শুনেও ফেলতেন কখনো কখনো। কিন্তু ঐ নিয়েও কোনদিনই তেমন কোন উৎসাহ যেমন দেখাননি , আবার বকাবকি করে একেবারে যে নিরুৎসাহ করে দেয়া, তেমনটাও করেননিং কোন দিন। তাতে একটা ব্যাপার অন্তত আমার কাছে খোলসা হয়ে গিয়েছিল যে কাকা হাতে ধরে আমাকে শেখান বা না শেখান , আমার সংগীত চর্চার ব্যাপারে তার একটা প্রচ্ছন্ন সমর্থন সেদিন অবশ্যই ছিল।

আমাদের বাড়ীটাতো সেই অর্থে একেবারে ঠিক খানদানি ওস্তাদজীদের বাড়ীর মতো তেমন ছিলনা যে বংশ পরম্পরা বাপ-ঠাকুর্দা সবাই একমাত্র রাগ - রাগিণীকে সম্বল করেই জীবন নির্বাহ করে এসেছেন অথচ প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা - দীক্ষার ক্ষেত্রে একেবারে অঙ্গুঠাছাপ , তেমন তো ছিল না। এবং বাবুকাকা সংগীতে এত নাম-যশ করেছেন বলে যে বাড়ীর পরবর্ত্তী প্রজন্মের এই আমাদেরকেও সংগীতের ব্যাপারে উৎসাহিত করা, সেটাতো হতই না , বরং উল্টোটাই ছিল সর্ব্বৈব সত্য। আমাদের জন্য একমাত্র নির্ধারিত লক্ষ্য ছিল - " ছাত্রাণাম অধ্যয়নং তপঃ "- তোমাকে ভালোভাবে পড়াশোনা করতে হবে , জীবনে তোমাকে মানুষের মতো মানুষ হতে হবে। মানে পড়াশোনাকে সঙ্গী করে গান-বাজনা দিয়েও যে মানুষের মতো মানুষ হওয়া যেতে পারে , যথেষ্ট সম্মান নিয়ে বাঁচা যেতে পারে , এই সত্যটা তাঁরা তেমন ভাবে ভাবতেই পারতেন না। বিশেষত আমাদের ফ্যামেলির general আইজেন হাওয়ার আমার মেজোকাকার চোখে তো ছেলেপুলের গান বাজনা করা প্রায় মহাপাপাচারের সামিল আর কি ! আমাদের সংগীত চর্চায় উৎসাহী করা তো দূর অস্তু , এমন কি বাবুকাকার মতো ওরকম গুণীর সংগীত চর্চা তথা ঐ নিয়ে চলতে গিয়ে তাঁর ঐ তথাকথিত বেহিসেবি জীবন যাপন নিয়েও মেজোকাকা ভেতরে ভেতরে মোটেই সন্তুষ্ট ছিলেন না । আসলে গান-বাজনার লাইনটা আজকে যতটা সম্মানীয় , এখন থেকে ষাট- সত্তর বছর আগেতো মোটেও তেমন ছিল না। গান - বাজনা নিয়ে যারা জীবন নির্বাহ করে ,

সেই ছেলেরা গোল্লায় যায় এবং সেই মেয়েরা প্রচলিত অর্থে বাঈজী বা তবায়েফে পরিণত হয় , এমন একটা বদ্ধমূল ধারণা তখনও ভারতীয় সমাজ থেকে একেবারে মুছে যায়নি। এই পটভুমিতে অর্থাৎ অতি বড়লোক বাড়ীর একমাত্র আদুরে ছেলে গান - বাজনায় উৎসাহিত হওয়ার ফলে চরিত্রভ্রষ্টের বদনাম নিয়ে বাড়ী থেকে বিতাড়িত হয়ে অথবা সংগীত চর্চায় বাবা - মা'র প্রবল আপত্তিতে বাড়ী থেকে পালিয়ে গিয়ে উপযুক্ত গুরুর তালিম পেয়ে প্রভূত যশ - প্রতিপত্তি লাভ করলে পর বাবা - মা ছেলের কাছে গিয়ে নিজেদের ভুল স্বীকার করে আবার তাকে স্বসম্মানে ফিরিয়ে এনেছেন , এমন প্লট নিয়ে বাংলা - হিন্দী সহ প্রায় সমস্ত ভারতীয় ভাষাতেই এই সেদিন পর্যন্তও বহু সিনেমাও হয়েছে এদেশে । হয়তো তাতে মানুষের বস্তাপঁচা ভাবনা চিন্তাগুলোও বদলেছে অনেকটাই । যাইহোক সেদিনের সমাজ ব্যবস্থার পটভূমিতে আমার মেজোকাকাও হয়তো সেই ট্রাডিশনাল মতবাদীই ছিলেন এবং তাঁর ইচ্ছা - অনিচ্ছা - নির্দেশ সমস্তই আমাদের ফ্যামেলিতে একেবারে বেদবাক্যের মতো মান্য ছিল। এ হেন আইজেন হাওয়ারের ইচ্ছের বিরুদ্ধে আমাদের পড়াশোনার পালা না মেটা পর্যন্ত গান - বাজনায় আমাদেরকে সরাসরি উৎসাহ দিতে বাবুকাকাও হয়তো সেই জন্যেই ততটা সাহসও পেতেন না। তবু প্রত্যক্ষভাবে না হলেও পরোক্ষভাবে তিনি যে আমার গান - বাজনার ব্যাপারে যথেষ্ট উৎসাহী ছিলেন ,সেটা টের পেতাম খুবই ।

পড়াশোনা, খেলা ধূলো এবং ঐ রকম এলোমেলো সামান্য গান-বাজনা , এভাবেই কাটছিল দিন। কিন্তু কলেজের দ্বিতীয় বর্ষে পড়ার সময় হঠাৎ চোখের সমস্যা দেখা দেয়ায় আমাকে হঠাৎ চশমা নিতে হ'ল। চশমা নেয়ার পর চোখের সমস্যা সেরে গেল ঠিকই , কিন্তু দেখা দিল তার চেয়েও বড় অন্য এক সমস্যা। যে সমস্যা আমার জীবনের গতিটাকেই একেবারে পাল্টে দিয়েছিল সমূলে। আমার মতো এরকম দস্যি প্রকৃতির ছেলে , যে কিনা কুস্তি লড়ে , বক্সিং করে , জিমনাস্টিক করে , ক্রিকেট খেলে সারাদিন কাটিয়ে দেয় , তার চোখে কি আর চশমা মানায়। দৌড় - ঝাঁপ করতে গেলেই চশমা চোখ থেকে ছিটকে গিয়ে কাঁচ যে কোথায় যেত আর ফ্রেম যে কোথায় যেত খুঁজেই পেতাম না। প্রথম প্রথম তবু রুমাল -টুমাল দিয়ে চশমাটা বেঁধে হয়তো খেলবার চেষ্টা করতাম , কিন্তু সেরকম করতে গিয়েও প্রায়ই এ্যাক্সিডেন্ট ঘটতে লাগলো , হুড়োহুড়িতে কাঁচ ভেঙ্গে গিয়ে প্রায়ই চোখের আশপাশ কেটে যেতে লাগলো। ব্যস দু- তিন দিন খেলা- ধূলো একেবারে বন্ধ। এই করে করে ধীরে ধীরে আমি বুঝে গেলাম যে চোখের জন্য চশমা সবসময় আমাকে পরতে হবে এবং চশমা পরলে খেলা-ধূলো আমাকে বন্ধ করতেই হবে। দুটো একসঙ্গে হবে না। তখন থেকেই মূলত আমার খেলা-ধূলোটা প্রায় বন্ধই হয়েগেল এবং ক্রমে আমি গান-বাজনার দিকে এসে যেতে থাকলাম। এখানে

একটা কথা বিশেষ করে বলব যে, মাত্র তের বছর বয়সে হঠাৎ অন্ধ হয়ে যাওয়ার দূর্ঘটনা যেমন বাবুকাকাকে সংগীতের দিকে নিয়ে এসেছিল , তেমনি ঐ চোখের সমস্যাই আমাকেও নিয়ে এসেছিল পুরোপুরি গান-বাজনার দিকে।

নিজের ইচ্ছের বিরুদ্ধে একান্ত অবস্থার তাগিদে খেলা -ধূলো প্রায় ছেড়ে দিয়ে যখন গান- বাজনাকেই আঁকড়ে ধরার মনস্থির করে ফেলেছি তখনও কিন্তু সিরিয়াসলি কাকার কাছে গান নিয়ে বসাই হচ্ছিল না। একদিকে মেজোকাকার কড়া মনোভাব তো ছিলই অন্যদিকে বাবু কাকা নিজেও তখন ভীষণ ব্যস্ত থাকতেন। আজ কোন ছবির সংগীত পরিচালনা করতে বম্বে গেলেন , তো দুদিন পর অনুষ্ঠান করতে চলে গেলেন লাহোর। কলকাতায় সপ্তাহ খানেক থেকে নিউ থিয়েটার্সের কাজ কর্ম সেরে আবার হয়তো অনুষ্ঠান করতে চলে গেলেন অন্য কোথাও। এর মধ্যেই চলত ওস্তাদজীদের কাছে তাঁর শাস্ত্রীয় সংগীতেরও তালিম। মানে ভীষণ ব্যস্ত থাকতেন সবসময়, আমার আর সুযোগ হচ্ছিল না কোন ভাবেই। সেরকম অবস্থায় একবার হ'ল কি , দেবকী বসুর কি একটা ছবিতে কাজ করতে উনি যখন বম্বে যাওযার জন্য প্রস্তুত,এমন সময় বাড়ীতে এলেন ওঁর গুরু ওস্তাদ দবীর খাঁ সাহেব। উনি এসে যখন দেখলেন যে কাকা বম্বে চলে যাচ্ছেন প্রায় ছ-মাসের জন্য , তখন কাকার সামনেই আমাকে বলে বসলেন,-"আরে বেটা , যব্ তক্ তুম্হারে চাচাজী লওটকে না আয়ে, ইয়ে দো মাহিনা তুম্হি কিঁউ না মুঝসে তালিম হাসিল কর লেতে ?" শুনে কাকা বল্লেন, -" হা ওস্তাদজী, যব তক ম্যায় বম্বেসে লওটকে না আউ , আপ মানাকো হি জরা তালিম দেতে রহিয়ে।"- বলে কাকা বম্বে চলে গেলেন এবং পরদিন থেকে সকাল- সন্ধ্যায় দবীর খাঁ সাহেবের কাছে আমারও শুরু হয়ে গেল শাস্ত্রীয় সংগীতের প্রথাবাহী তালিম। আসলে পুরো ব্যাপারটাই একটা শুভ যোগাযোগের ফলশ্রুতি। তা না হলে কাকা বম্বে রওনা হওয়ার প্রাক মূহূর্তে দবীর খাঁই বা এলেন কেন এবং আমার মতো ওরকম আনাড়ি সংগীত পিপাসুকে যেচে তালিম দেবারই প্রস্তাব করলেন কেন ! হয়তো কাকার সেই আশ্বাসবাণীই ঘটনা চক্রে সেদিন বাস্তবায়িত হয়ে গিয়েছিল। কাকার গুরু হয়ে গেলেন আমরাও সংগীত গুরু।

ওস্তাদজী মানুষ হিসাবে খুবই ভালো ছিলেন , কিন্তু শেখানোর সময় যেমন মেজাজ করতেন আমার ঠিক ভালো লাগতো না । আসলে কাকার কাছে ততদিনে যতটুকু যা শিখেছি সব তো এককথায় শিশুকে ঘুম পাড়াতে মায়ের বাৎসল্য মেশানো ঘুমপাড়ানির গানের মতো সহজ করে শিখেছি , সেক্ষেত্রে ওস্তাদজীর ওরকম কথায় কথায় খানদানি মেজাজ ভালো লাগবার অবশ্য কোন কারণও ছিলনা। তাছাড়া উনি এত নামকরা ওস্তাদ হলেও তাঁর কাছে গান শিখতে আমার মোটেই ভালো লাগতো না , আমার স্বভাবের সাথে মিলতো না বলে। দবীর খাঁ সাহেবের গান

ছিল বেশ একটু গম্ভীর -ভারিক্কি চালের। উনিতো ছিলেন রামপুরের বিখ্যাত ওস্তাদ উজীর খাঁ সাহেবের নাতি এবং মূলত বীণকার , তথা ধ্রুপদ- ধামার গাইয়ে। আর আমিতো ছিলাম একটু ছটফটে প্রকৃতির , ওঁর ঐ ধ্রুপদের নোম্‌তোম্‌ ইত্যাদি অতি বিলম্বিত আলাপ - বিস্তার শেখায় কোন উৎসাহই পেতাম না, আমার বরাবরই মনে হয়েছে ঐধরণের গান-বাজনা করার জন্য ঐরকম একটা বিশেষ মানসিক প্রস্তুতি থাকা দরকার , ওরকম একটা পরিবেশ থাকা দরকার। কিন্তু বাস্তবে ঐরকম নোম ,তোম , দির, দির দিয়ে ঢিমে তালের আলাপ বিস্তার করার মানসিকতাই আমার মধ্যে কোনদিন ছিলনা। সেই জন্যেই দবীর খাঁ সাহেবের তালিম আমার একদম ভালোলাগতো না। শুধু কাকা বলে গেছেন , তাই উনি এলে যন্ত্র-চালিতের মতো দু বেলা শুধু তানপুরা নিয়ে ওনার সামনে বসতাম এবং নিজের ইচ্ছের বিরুদ্ধেই ওস্তাদজীর সাথে সাথে সুর লাগিয়ে যেতাম। কিন্তু তাতে আমার মনও বসতোনা,কোন লাভও হ'ত না। এই করে করে তখন এমন একটা অবস্থা হয়ে গিয়েছিল যে আমি তখন মনে মনে ঠিক করে ফেলেছিলাম যে আমাকে যদি ঐ রকম গান-বাজনাই শিখতে হয়, তাহলে আমি গান - বাজনাই ছেড়েদেবো। এমন হয়ে গিয়েছিল আমার মনের অবস্থা। দু - মাস পর কাকা বম্বে থেকে ফিরে আমার এই অবস্থা দেখে খুবই মনক্ষুন্ন হলেন আমার ওপর এবং তখন থেকেই নিজে আমাকে নিয়ে নিয়মিত তালিমে বসতে লাগলেন। তবলা , তানপুরা নিয়ে আমি , আমার বড়দা প্রণবদে রোজ দু বেলা গান নিয়ে বসতে লাগলাম। রোজ সকাল বেলা ঠিক ছটায় কাকা এসে ডাক দিতেন "মানা ওঠো।" এক ডাকেই উঠে পড়তে হ'ত। শুরু হ'ত তানপুরা নিয়ে রেয়াজ। বিন্দু মাত্র ফাঁকি দেয়ার জো নেই। ফাঁকি দেখলেই যে রকম তিক্তভাষায় উনি আমায় তিরস্কার করতেন, তা শুনলে কেউ বলবে না উনি আমার কাকা এবং ওঁর গানের গলা এত মিষ্টি। কিন্তু রেয়াজ শেষ হয়ে যেতেই উনি একেবারে অন্য মানুষ হয়ে যেতেন।

গান শিখতে শিখতেই একদিন সাহস করে কাকার কাছে বায়না ধরলাম , কাকার সঙ্গে স্টুডিওতে যাবো। তখন গায়ে-গতরে বেশ জওয়ানই হয়ে গেছি এবং স্কটিশ থেকে ইন্টারমিডিয়েট করে ততদিনে বিদ্যাসাগর কলেজে স্নাতক ক্লাসে পড়ছি। মানে এককথায় আজকের ভাষায় অ্যাডাল্ট হয়ে গেছি। তাই কাকাও বিশেষ আপত্তি করলেন না। বল্লেন - "ঠিক আছে চলো।" তার দু- একদিন পর কাকার সঙ্গে সত্যি সত্যিই স্টুডিও দেখতে গেলাম। আর স্টুডিও মানে তো যেই সেই স্টুডিও নয় , তখনকার দিনের ভারত বিখ্যাত স্টুডিও, - নিউথিয়েটার্স স্টুডিও। জীবনে সেই আমার প্রথম স্টুডিও পাড়ায় যাওয়া। রাইচাঁদ বড়ালের সুরে কি একটা ছবিতে গান-গাইবার জন্য কাকা সেদিন নিউথিয়েটার্সে গিয়েছিলেন। ঘরের সবার সাথে কাকা আমার পরিচয় করিয়ে দিলেন। রাইবাবুকে তা আগে থেকেই চিনতাম, অন্যদের সাথেও এবার পরিচয়

হ'ল। যন্ত্রীরা তো যে যার মতো যন্ত্র টন্ত্র বেঁধে সবাই প্রস্তুত হচ্ছে, কিন্তু আমার তো ওখানে করার কিছু ছিল না। তাই চুপচাপ বসে রইলাম ঘরেরই এক কোণে। ক্ষণিক পরেই শুরু হ'ল গান শেখানোর পালা। রাইবাবু গান তোলাচ্ছেন, কাকা তুলছেন। গানের সেকি রিহার্সাল! এখনকার শিল্পীরা কল্পনাও করতে পারবে না সে রকম ঘটনা। পুরো তিন ঘন্টা ধ'রে চলল গান তোলাবার মহড়া। সামান্যতম খুঁত রাখতেও রাজী নন কেউ। রাইবাবু যখন বলছেন,- " ঠিক আছে;" কাকা বলছেন-"আর একবার গাই।" আবার কাকা যখন বলছেন- " ঠিক আছে," রাইবাবু বলছেন- " আর একবার হয়ে যাক।" এই রকম ঘষামাজা করতে করতে গানটা যখন দুপক্ষেরই পছন্দ মতো হ'ল তখন পাক্কা তিন ঘন্টা কাবার। এর কয়েক দিন পর আবার একদিন কাকার সঙ্গে নিউ থিয়েটার্সে গেলাম। সেদিন ছিল কাকার সংগীত পরিচালনায় তখনকার দিনের বিখ্যাত ছবি "আঁধি" র গান রেকর্ডিং।

এ্যাসোসিয়েটেড প্রোডাকশনের এই ছবির নায়ক-নায়িকা ছিলেন পঙ্কজ মল্লিক ও মলিনা দেবী এবং সে ছবিতে কাকাও কি একটা চরিত্রে যেন অভিনয় ও করেছিলেন। নায়ক - গায়ক পঙ্কজ মল্লিকের তখন সারা ভারতবর্ষেই খুব নাম ডাক। নাম- ডাক মানে আমার স্পষ্ট মনে আছে, তখনকার দিনে পঙ্কজ মল্লিকের গান সম্পর্কে কলম্বিয়া গ্রামাফোন কোম্পানী বিজ্ঞাপন দিত -" Is your favourite Pankaj Mullick or Bing Crosby ? Hear them both on the finest name on record" সেই সঙ্গে পাশাপাশি দুজনের দুটি ছবিও থাকতো। এত জনপ্রিয় ছিল তখন পঙ্কজ মল্লিকের গান। যাই হোক কাকা "আঁধি' ছবির জন্য গান তোলাতে লাগলেন পঙ্কজ বাবুকে। সে আর তিন ঘন্টায় হল না। পুরো তিনদিন ধরে চলল সেই গান তোলানোর মহড়া। তারপর রেকর্ড হ'ল সে গান। গান- বাজনার ব্যাপারে এত নিখুঁত ছিলেন তখনকার দিনের শিল্পীরা। কি করে গানটাকে আরো সুন্দরতর করা যায়, কি করে সংগীত পরিচালক সুরের মধ্য দিয়ে যা চাইছেন, সেটাকে গলায় তুলে দেয়া যায় এই নিয়ে তখনকার দিনের শিল্পীদের চেষ্টার কোন কমতি থাকতো না। প্রসঙ্গক্রমে বলি, জীবনের প্রথম পর্বে পঙ্কজ বাবু যেমন কাকার কাছে গান তুলেছেন, তেমনি পরের দিকে পঙ্কজ বাবুর সংগীত পরিচালনায় কিছু কিছু ছবিতে কাকাও বেশ কয়েকটি গান গেয়েছিলেন। এ ব্যাপারে লক্ষনীয় ব্যাপার হচ্ছে পরিচালক যত বড় হোক আর গায়ক যতই নবীন হোক অথবা পরিচালক যত নবীনই হোক আর গায়ক যত প্রবীণই হোক, কোন ক্ষেত্রেই গানের ব্যাপারে কিন্তু কোন রকম আপোষ হ'তনা বা কোন রকম অহং কেউই দেখাতেন না। গানটাকে পরিচালকের চাহিদা মতো, সেই ভালো লাগার পর্যায়ে পৌঁছে দেয়াই ছিল তখনকার দিনের প্রত্যেক শিল্পীরই একমাত্র লক্ষ্য। সেদিনের সেই সুস্থ-সতেজ পরিবেশ নিয়ে পঙ্কজ বাবু তার আত্মজীবনী "আমার যুগ

আমার গান'' বইয়ের এক জায়গায় লিখেছেন , -''....সংসারে কতো বিচিত্র ব্যাপারই না ঘটে। কালক্রমে আমি সুরকার ও সংগীত পরিচালক হলাম , এবং সেই সুবাদেই তাঁকে গান তোলাবার দরকার হ'ল বহুবার। এক সঙ্গে বসতাম যখন , ভুলে যেতাম আমি ওঁর পরিচালক। একত্রে বসলেই আমার মনে হ'ত উনিই নেতা, আমি ওঁর অনুচর মাত্র। তারপর দুজনে একত্রে সুরের সীমানাহীন রাজ্যে বিচরণ করতাম ,............... সবচাইতে মজা হতো যখন উনি নিজে গেয়ে নিজেই বলতেন - উঁহু ঠিক হলো না তো, তোমার মতো হলো না হে , তুমি পরিচালক, আমার কাজ হচ্ছে তোমাকে ঠিক ঠিক অনুসরণ করা, অথচ দেখো তো কী কান্ড, এযে আমার মতন হয়ে যাচ্ছে। আমি যত বলি - এই খুব ভালো হয়েছে কেষ্টদা , আপনি আপনার মতোই করুন,এটাই বেশী জমেছে, তিনি তত বলেন ,- না হে না , তোমারটিই বেশি ভালো,''তুমি হচ্ছ গিয়ে সংগীত - পরিচালক।'' এ এক বিচিত্র কৌতুক ! কেষ্টদার ভঙ্গিটি সত্যিই আমার বেশি পছন্দ হয়েছে , চাইছি ওটাই থাক ; কেষ্টদার কিন্তু অতৃপ্তি ও বিনয়ের যেন শেষ নেই।উনি কিছুতেই সংগীত পরিচালকের মতো না করে ছাড়বেন না ! ...... '' এ থেকেই বোঝায়ায় তখনকার দিনে গানবাজনার পরিবেশটা কত হেলদি ছিল।

পড়াশোনা এবং গান শেখার পাশাপাশি যখনই সুযোগ পেতাম প্রায়ই , এভাবে কাকার সাথে কখনো নিউথিয়েটার্সে কখনো কালী ফিল্মসে, কখনো অন্যত্র নিয়মিত যাওয়া- আসা চলতে লাগলো।তখন তো আমি নেহাৎ কলেজ - পড়ুয়া একজন সদ্যযুবক।কাকার সাথে নিতান্ত শখে স্টুডিও দেখতে যাওয়া। ওখানে আমার তখন কোনভাবেই কোন রকম ইনভল্ভ্মেন্টই থাকতো না, যে যার মতো কাজ করতো, আর আমি সদ্য গ্রাম থেকে আসা কিশোরের অবাক হয়ে শহর দেখার মতো চুপচাপ বসে বসে শুধু তাঁদের কাজকর্ম দেখতাম ,ব্যস ঐ পর্যন্তই। কিন্তু ঐ দেখাটাও যে একজন সংগীত শিল্পীর জীবনে কত বড় শিক্ষা , কত মূল্যবান . অভিজ্ঞতার সঞ্চয়, সে সব কথা সে বয়সে না বুঝলেও পরে বড় হয়ে গানকেই জীবিকা করে পথচলার সময় প্রতি মুহূর্তেই আমি উপলব্ধি করেছি। ওখানে দেখতাম গীতিকার , সুরকার , গায়ক , সমস্ত যন্ত্রীরা , পরিচালক , অভিনেতা সবাই মিলে এককেটা গান নিয়ে যেন রীতিমতো গবেষণা করতেন। সবাই খুব সিরিয়াসলি ভাবতেন যে একটা গানকে কি করে সেই রকম ভালো লাগার পর্যায়ে পৌঁছে দেয়া যায়। কোন্ গানে কোন্ যন্ত্র কিভাবে বাজবে , কতটা বাজবে , কথার ব্যঞ্জনা কি ভাবে অর্থবহ করে তুলতে হবে , এ নিয়ে প্রতকেরই দেখতাম ভাবনার শেষ থাকতো না। তখন তো রেকর্ডিং ব্যাবস্থা আজকের মতো এতো উন্নত পর্যায়ের ছিলনা , কিন্তু ঐ প্রাথমিক পর্যায়ের যন্ত্র দিয়েই যেভাবে তাঁরা এক একটি গানকে প্রাণ পাইয়ে দিতেন , সে সব ব্যাপার গুলো আমার একটি অনুসন্ধিৎসু নবীন শিক্ষার্থীকে তখন ভেতরে ভেতরে

ভীষণ নাড়িয়ে দিয়ে যেত। বোধহয় এসব দেখে দেখে, শুনে শুনে গায়ক হবার অর্থাৎ গানকে পেশা করে জীবন নির্বাহ করার ইচ্ছেটা ক্রমশই আমার মধ্যে অত্যন্ত প্রবল হয়ে উঠেছিল।

আমাদের ফ্যামিলির " জেনারেল আইজেন হাওয়ার "ছিলেন আমার মেজকাকা। বাড়ির ছেলেমেয়েরা কে কি করবে, না করবে, এই সমস্ত কিছুই ঠিক করতেন আমার এই মেজোকাকা। তাঁর সিদ্ধান্তের ওপর কারোই আর কোন পাল্টা যুক্তির কোন প্রশ্ন থাকতো না। মেজো কাকার সিদ্ধান্তই ছিল আমাদের ভবিষ্যৎ জীবন পন্থার একমেবাদ্বিতীয়ম শেষ কথা। আমাদের একান্নবর্ত্তী পরিবারে এটাই তখন সর্বসম্মত নিয়ম বলে প্রচলিত ছিল। আমার মেজদা প্রকাশ দেকে উনি বল্লেন, "তোমাকে ডাক্তার হতে হবে।" তাকে তাই হতে হয়েছে। আমার ছোট ভাই প্রভাসকে বলেছিলেন ইঞ্জিনীয়ারিং পড়তে, ওকে ইঞ্জিনীয়ারিংই পড়তে হয়েছিল। মানে এককথায় উনি যাকে যে লাইন বাতলে দিয়েছেন, আমাদের বাড়ীতে তাকে তাই হতে হয়েছে। এর কোন নড় চড় হয়নি কোনদিন। কিন্তু বিপদ হ'ল আমার লাইন নির্বাচনের সিদ্ধান্ত নেয়ার বেলায়। কলেজ শেষ করার পর মেজো কাকা একদিন ডেকে বল্লেন, - "এবার তোমাকে Law পড়তে হবে।" এই সিদ্ধান্ত শুনে আমার তো যেন মাথায় বাজ পরেছে আর কি! আমি কিনা ভাবছি বাবুকাকার মতো অনেক বড় গায়ক হব, বাবুকাকার মতোই গান-বাজনা নিয়েই সারাটা জীবন কাটিয়ে দেবো, আর মেজো কাকা বলছেন কিনা উকিল হতে! এযে অসম্ভব, এযে আক্ষরিক অর্থেই কোকিলকে উকিল বানানোর প্রাণান্তকর প্রয়াস বৈ তো নয়! মেজো কাকার সেই প্রয়াস আমার মতো সংগীত প্রিয় যুবকের জীবনে যে সেদিন কতটা দুর্বিষহ, কতটা পীড়াদায়ক হয়ে বুকে বেজেছিল, তা বোধহয় দেবদাসকে ছেড়ে অন্যত্র বিয়ে করতে বাধ্য হওয়া অসহায় পার্বতীর বেদনাঘন হৃদয়ের দীর্ঘশ্বাসের সাথেই একমাত্র তুলনা করতে পারি। দেবদাসের মৃত্যুর পর পার্বতীর জীবনের পরিণতি যেমন অস্পষ্ট থেকে গেছে, তেমনি সংগীতের সাথে সত্যি সত্যিই আমার চিরকালীন বিচ্ছেদ হয়ে গেলে পর আমার শিল্পী জীবনের কি পরিণতি হত বলা কঠিন।তবে আমার সেই শামলা জড়িত না হওয়া এজলাসী জীবন সম্পর্কে ভাবতে গেলে, সেই নিয়ে গভীর কবি-কল্পনায় ডুবে গেলে আজও যেন স্পষ্ট দেখতে পাই হাইকোর্টে ঐ বড় বড় পিলার গুলোর কোন একটির পাশে দাঁড়িয়ে চুয়াত্তর বছরের বৃদ্ধ ক্লান্ত ব্যারিস্টার শ্রী প্রবোধচন্দ্র দে চোর- ডাকাত- স্মাগলারের কাহিনী শুনতে শুনতে পুরু কাঁচের মধ্য দিয়ে কেমন উদাস চোখে কি যেন খুঁজতে চাইছেন নিজের গুমোট অন্তরেরই কোন্ গহনে। স্মৃতির শীষমহলে হঠাৎ যেন জ্বলে উঠে হাজার শিখার সেই ঝাড়বাতিটা, আতরের মিষ্টি গন্ধে মেহ্ফিলের রঙটাও যেন পাল্টে যায় তার উদাস দুটি ফিকে হওয়া চোখে। ফুটপাথের কোন্ চা-ওয়ালার পুরনো রেডিও থেকে অস্পষ্ট ভেসে আসে

কোন্ এক মান্না দের গাওয়া ছায়াছবির গান :-

" আমি উকিল না হয়ে যদি
কোকিল হতাম।
কুহুকুহু স্বরে গান শোনাতাম।
আর নথিপত্র যদি , প্রেমপত্র হতো
প্রেমের সাগরে দোঁহে ডুবে মরতাম।...........
.... আর আদালতটা যদি হত বৃন্দাবন ,
প্রেমের খেলায় নাগর হয়ে বাঁশী বাজাতাম।.........
.... আর গোপিনীরা হত যদি , মুহুরী পিওন,
তাদের নিয়ে যমুনাতে কেলী করতাম ....।"

-প্রবোধ বাবু ভেবে পাননা এ গান নিতান্তই কোন ছায়াছবির গান , নাকি তারই আক্ষেপ ভরা করুণ জীবন কাহিনী নিয়ে মান্নাবাবুর শৈল্পিক রসিকতা মাত্র।

সত্যি কথা বলতে কি বাবুকাকারা যখন গান-বাজনা করেতেন অর্থাৎ এখন থেকে ষাট- সত্তর বছর আগেও এদেশে গান- বাজনার জীবিকাকে মোটেও তেমন সম্মানের চোখে দেখা হ'তনা। রাজা- মহারাজাদের হারেম সংলগ্ন দরবার এবং বাঈজীদের চিলেকোঠা থেকে বেরিয়ে সংগীত তখন সবে মাত্র সাধারণ মানুষের আঙিনা পর্যন্ত পৌঁছেছে , তখনো অন্দর মহলে যাওয়ার ছাড়পত্র সে পায়নি। রাইচাঁদ বড়াল , জ্ঞান গোঁসাই কৃষ্ণচন্দ্র দে , পঙ্কজ মল্লিক প্রমুখ কিছু কিছু মানুষ গান - বাজনাকেই পেশা হিসাবে বেছে নিলেও বা সংস্কৃতিবান উচ্চ বিত্ত কিছু কিছু মানুষ শখের গান- বাজনা করলেও ছেলে - মেয়ের গান - বাজনা করার প্রসঙ্গ এলেই স্বভাবতই গুরুজনেরা তাতে কেমন যেন একটা বাঈজী বাঈজী গন্ধ খুঁজে পেতেন। অর্থাৎ গান-বাজনা করলো কি ছেলে-মেয়েরা একেবারে বখে গেল ,- এমন একটা ধারণা তখনও আমাদের সমাজে বদ্ধমূল ছিল। যেকারণেই গান- বাজনা ভালোবাসলেও বা নিজেরা টুকটাক গান - বাজনা করলেও অথবা সকাল সন্ধ্যায় বেশ ভক্তিভরে -" নাহং তিষ্ঠামি বৈঁকুন্ঠে ,যোগীনাম হৃদয়ে ন চ। মদ্ভক্তা যত্র গায়ন্তি তত্র তিষ্ঠামি নারদ" ইত্যাদি স্তোত্র পাঠ করলেও বাস্তবে কোন অভিভাবকই চাইতেন না যে তাদের নিজের বাড়ীর কোন ছেলে-মেয়ে কোনদিন গায়ক- বাদক হোক। অনেকটা যেন সেই সন্ন্যাস ধর্ম গ্রহণ করার মতো ব্যাপার আরকি ! বিবেকানন্দ বা অভেদানন্দ সন্ন্যাসী কে বাংলার সব মায়েরাই ভালো বাসেন, শ্রদ্ধা করেন ঠিকই কিন্তু তাই বলে নিজের ছেলেটিও একদিন ঐ রকম সন্ন্যাসী হয়ে যাক এটা বোধ হয় কোন মা-ই কোন দিন মন থেকে চায়নি।

যাইহোক , মেজোকাকার ওরকম নীরস সিদ্ধান্ত শুনে প্রথমত খুবই মুষড়ে পড়লেও অনেক সাহস করে তবু মেজো কাকাকে বল্লাম যে ওকালতি , ড়াক্তারী বা ইঞ্জিনীয়ারিং ইত্যাদিতে আমার একেবারে মন

নেই। গান- বাজনাই আমায় ভীষণভাবে টানে। আমি গায়ক হব। আমার ওরকম পাল্টা জবাব শুনে বেশ রাগত স্বরেই উনি বল্লেন , -" না , না , তোমাকে গায়ক -টায়ক হতে হবে না, তুমি লয়্যারই হবে। দেখছোনা তোমার বাবুকাকাকে ! রাতদিন শুধু গান , আর গান ! সারা রাত গান করে ভোরবেলা বাড়ী ফিরলো কি না ফিরলো চলে গেল সুটিং এ। দুপুর তিনটেয় ফিরে ভাত খাচ্ছে। আবার সন্ধ্যা হতেই চলল ফাংশন করতে। এই কি জীবন ! মানুষ এরকম ভাবে বেঁচে থাকতে পারে ! জীবনে কোন ডিসিপ্লিন নেই। ওরকম ইনডিসিপ্লিনড্ তোমাকে হতে হবে না। তুমি ল' পড়ার জন্য তৈরী হও।"

আমি দেখলাম যে মেজোকাকাকে ম্যানেজ না করতে পারলে আমার গান -বাজনার ওখানেই ইতি হয়ে যাবে এবং ঐ শামলা চাপিয়ে সত্যকে মিথ্যে আর মিথ্যেকে সত্য বানানোর আইনি বুলি আওড়েই আমাকে পেট চালাতে হবে। মনে মনে জেদ চেপে গেল যে করেই হোক ওরকম অনাকাঙ্খিত জীবন থেকে আমাকে নিষ্কৃতি পেতেই হবে। অনেক ভেবে চিন্তে শেষ পর্যন্ত আমাদের সব ভাই- বোনের অভিভাবক কাম বন্ধু ছোটি কাকার কাছে গিয়েই সব খুলে বল্লাম। উনিতো মনে মনে চাইতেনই যে আমি, পুরোপুরি ভাবে গানের জগতেই চলে আসি।সব কিছু শুনে স্নেহ মাখা স্বরে শুধোলেন , -" তুই সত্যিই গায়ক হতে চাস ?" ওরকম স্নেহ মাখা প্রশ্ন শুনে কাকার পায়ের কাছে বসে আমি সেদিন বলেছিলাম , -" হ্যা বাবুকাকা আমি গান শিখতে চাই। " কাকা তাঁর হাতটা আমার কাঁধে রেখে সেদিন বলেছিলেন,- " মানা, এ শেখার কোন শেষ নেই। কিন্তু মনে রাখিস এ বড় নিষ্ঠার জিনিষ,পরিশ্রম না করলে এ জিনিষ কেউ শিখতে পারে না। তুই পারবি নিজেকে সেভাবে খাটাতে ?" আমি বল্লাম- " তুমি শেখালে আমি নিশ্চয়ই পারবো। খাটতে আমার কোন ভয় নেই।"তার পর যে করেই হোক দু- একদিনের মধ্যেই উনি বলে কয়ে মেজো কাকাকে ম্যানেজ করে একদিন ভোর বেলা যখন আমাকে কাছে ডেকে মাথায় হাত রেখে বল্লেন ,-" নে , তোকে আর শামলা চড়িয়ে কোনদিনই আদালতে যেতে হবে না। আজ থেকে তোর নতুন জন্ম হ'ল। আশীর্বাদ করি তোর স্বপ্ন সার্থক হোক।"প্রণাম করতে গিয়ে কাকার পা জড়িয়ে সেদিন আমি আনন্দে একেবারে কেঁদে ফেলেছিলাম।

কাকার কাছে সংগীতের তালিম নেয়ার পাশাপাশি স্টুডিও পাড়ায় নিয়মিত যাতায়াতটাও তখন মোটামুটি আমার রুটিন ওয়ার্কের মতোই হয়ে গিয়েছিল। আমারতো সেখানে কোন কাজ থাকতো না , কাকাকে খাতাটা এগিয়ে দেয়া, পানটা - সিগারেটটা এগিয়ে দেয়া এসব ছোটখাটো কাজ গুলো করতাম আর কাকা কি করে সুর করছেন,রাই বাবু , পঙ্কজবাবু কি করে কি করছেন , কে কিভাবে যন্ত্রানুষঙ্গ ব্যাবহার করছেন এই সব চুপচাপ বসে বসে শুধু দেখতাম। ওখানে এই দেখা ও শোনা ছাড়া

প্র্যাকটিক্যালি আমার আর কিছুই করণীয় থাকতো না অন্যদিনের মতো সেদিনও আমি কাকার সাথে প্রিয়নাথ গাঙ্গুলীর স্টুডিও ''কালী ফিল্মসে'' গেছি। গিয়ে দেখি সেদিন ' কচ্ ও দেবযানী ' ছবির গান রেকর্ডিং হবে , তারই রিহার্সাল হচ্ছে। কাকা ছিলেন সে ছবির সংগীত পরিচালক এবং কচ্ এর ভূমিকায় অভিনয় করেছিলেন মঙ্গল চক্রবর্ত্তী। পরবর্ত্তী কালে যিনি চিত্রপরিচালক হিসেবেও যথেষ্ট খ্যাতি অর্জন করেছিলেন। যাই হোক , সেদিনও আমি চুপচাপ বসে রিহার্সাল শুনছি , অভিনেতাদেরকে' দেখছি , এসব করেছি , এমন সময় কাকা হঠাৎ আমায় ডেকে বল্লেন ,- ''মানা এদিকে এসো ,আমার সঙ্গে কাজ শিখবে। আজ থেকে তুমি হলে আমার সেকেন্ড অ্যাসিস্ট্যান্ট।'' কাকার ফাস্ট এ্যাসিস্টেন্ট ছিলেন বিষ্ণু মিত্তির। উনি দারুণ ভালো বাঁশী বাজাতেন। যাইহোক , সংগীত পরিচালনায় সেই আমার হাতেখড়ি এবং এরপর থেকে নিয়মিত ভাবে প্রত্যেক ছবিতেই কাকার সেকেন্ড অ্যাসিস্টেন্ট হিসাবে কাজ করে করে খুব অল্পদিনের মধ্যেই সংগীত পরিচালনার ভাইটাল ব্যাপার গুলো বেশ কিছুটা আয়ত্বও করে ফেল্লাম।

ছবির জগতে কলকাতার নিউ থিয়েটার্সের তখন ভারত জোড়া নাম। হিন্দী এবং বাংলা ভার্সানের বিখ্যাত বিখ্যাত বহুছবি যেমন এখান থেকে হয়েছে তেমনি পৃথ্বিরাজ কাপুর ,সায়গল, প্রমথেশ বড়ুয়া , দুর্গাদাস ব্যানার্জী , উমাশশী ,কাননদেবী, পাহাড়ী সান্যাল প্রমুখ বহু অবিস্মরণীয় অভিনেতা - অভিনেত্রীরও আত্মপ্রকাশ ও প্রতিষ্ঠা ঘটেছিল হাতিমার্কা কোম্পানী এই নিউ থিয়েটার্স স্টুডিওয়। নিউ থিয়েটার্সের আগে কলকাতায় ছবির জগতে একচেটিয়া আধিপত্য ছিল জামসেদজি ফ্রামজি ম্যাডানের ''ম্যাডান কোম্পানীর''। আমরা যখন একেবারেই ছোট, তখন ১৯৩০ সাল নাগাদ কোন এক সময়ে এই ম্যাডান কোম্পানী থেকেই তৈরী হয়েছিল প্রথম সবাক বাংলা ছবি-'' জামাই ষষ্ঠী।'' নিউ থিয়েটার্সের আগে '' ম্যাডান কোম্পানী '' ছাড়াও ''অরোরা সিনেমা কোম্পানী ,'' ইন্দো বৃটিশ ফিল্ম কোম্পানী ,'' ''তাজ মহল ফিল্ম কোম্পানী '' ইত্যাদি আরো বেশ কিছু কোম্পানীরও খুব নাম - ডাক ছিল। কিন্তু বীরেন্দ্র নাথ সরকারের নিউ থিয়েটার্সের প্রতিষ্ঠার পর থেকে অন্যান্য ফিল্ম কোম্পানীগুলো ক্রমশই ম্লান হয়ে যেতে থাকে। এই নিউ থিয়েটার্সেই সংগীত পরিচালক হিসেবে কাজ করতেন আমার কাকা , রাঁইচাদ বড়াল , পঙ্কজ মল্লিক , তিমির বরণ , ক্ষেমচাঁদ প্রকাশ প্রমূখ ভারত বিখ্যাত আরো অনেক অনেক সব গুণী সংগীত রথী - মহারথীরা। মানে এককথায় সব দিক থেকেই নিউ থিয়েটার্স তখন আক্ষরিক অর্থেই চাঁদের হাট। কাকার সেকেন্ড অ্যাসিস্টেন্ট হিসেবে , খুদে সংগীত পরিচালক এই আমারও তখন সেই চাঁদের হাটে নিত্য যাতায়াত শুরু হয়ে গেছে। নিউ থিয়েটার্সের দু- নম্বর স্টুডিওতে আমার বড়দা প্রণব চন্দ্র দেও তার আগে থেকেই producer ছোটাই মিত্তিরের

ওখানে সংগীত পরিচালক হিসাবে কাজ করতেন। একদিন কি একটা কাজে যেন ঐ দু - নম্বর স্টুডিওতে গেছি, গিয়ে দেখি তিমির বরণ কোন একটা ছবির জন্য সুর করছেন আর তার সহকারী হিসেবে তাঁকে সাহায্য করছেন একজন অবাঙালী ভদ্র লোক। - নাম ক্ষেমচাঁদ প্রকাশ। যিনি পরবর্ত্তীকালে বোম্বাইতে বিখ্যাত সুরকার হিসাবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন। তিনি ভালো গাইতে পারতেন, বাজাতে পারতেন, - অত্যন্ত গুণীলোক ছিলেন। অরিজিন্যালি উনি ছিলেন রাজস্থানের লোক। এদের সবার কাজ কর্মের ধারা দেখতে দেখতে, কাকার দ্বিতীয় সহকারী হিসেবে কাজ করতে করতে একক ভাবে সুর করার ব্যাপারেও আমি ভিতরে ভিতরে তখন খুব একটা তাগিদ অনুভব করতাম। এবং সেই আত্মিক তাগিদেই সবার অজান্তে দু-একটা গানে ইতিমধ্যে সুরও করে ফেল্লাম । কিন্তু কাউকে শোনানোর আর ঠিক সাহস হচ্ছিল না। এই সময় বড়দার সাথে দেখা করতে একদিন দু-নম্বর স্টুডিও তে যেতে দাদার Boss ছোটাই মিত্তির ডেকে বল্লেন, -" কি মামা, কি করছিস আজকাল ? " আমি বললাম, -" এই, কাকার কাছে থেকে গানে একটু আর্ধটু সুরটুর করছি। " উনি বল্লেন -" কই, দেখি কেমন সুর করেছিস। শোনা দেখি দু -একটা।" আমিতো সেরকম সুযোগেরই অপেক্ষায় ছিলাম। সুযোগ মিলতেই হারমোনিয়াম নিয়ে পর পর শুনিয়ে দিলাম আমার জীবনের প্রথম একক ভাবে সুর করা দু-দুখানা গান । একটা গান ছিল, -" ওগো সারাটি যামিনী জাগি, গোপন কথাটি কও ...." এবং অন্যটি ছিল, -" বালুকা বেলায় অলস খেলায় যায় বেলা।" দুটো গানই শৈলেন দা অর্থাৎ শৈলেন রায়ের লেখা। শৈলেন দা ছিলেন কুচবিহারের ছেলে। কিন্তু কাকার কাছে গান শেখার সুবাদে খুব ছোট বয়স থেকেই আমাদের বাড়ীতেই উনি থাকতেন এবং আমাদের নিজের দাদার মতই হয়ে গিয়েছিলেন। তাঁর অভ্যেস ছিল একটু আর্ধটু সাহিত্য চর্চা করা, কবিতা লেখা, গান লেখা ইত্যাদি লেখা লেখি করা। সেই শৈলেনদার গান দিয়েই আমার একক ভাবে সুর করার সূত্রপাত।এবং যতদূর মনে পড়ছে শৈলেনদার গানেও সেই প্রথম সুরারোপ হ'ল। যাই হোক প্রথম গানটা শুনেই ছোটাই দা বল্লেন, -" বাঃ,খুব সুন্দর সুর করেছিস তো গানটার। এই গানটা তুই সায়গল সাহেব কে দিয়ে গাওয়াবি। ওর গলায় এই গানটা খুব খুলবে।" কিন্তু শেষ পর্যন্ত সেই গান সায়গল সাহেব কে দিয়ে আর গাওয়ানো হয়নি। তবে দ্বিতীয় গানটা পরে HMV থেকেই রেকর্ড হয়েছিল। গেয়েছিলেন স্বনামধন্যা সুপ্রীতি ঘোষ।